ইউনিট ১৪

উদ্ভিদের বিভিন্নতা

ভূমিকা

আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা ধরনের অসংখ্য উদ্ভিদ ছড়িয়ে আছে। এ বিচিত্র পরিবেশের কোথাও উদ্ভিদশূন্য নয়। জলাশয়ের বেশ গভীরে যেমন রয়েছে উদ্ভিদ, তেমনি এরা রয়েছে সুউচ্চ পর্বতমালার বিভিন্ন অঞ্চলে। ভিজা কাদাময় স্থানে যেমন উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়, তেমনি উত্তপ্ত পাথর ও হিমশীতল বরফখণ্ডেও এরা জন্মাতে পারে। জলে স্থলে আমরা নানা ধরনের উদ্ভিদের সমাবেশ দেখতে পাই, এদের মধ্যে অনেকগুলো এত ছোট যে, তাদেরকে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের সামনে দাঁড়ালে নিজেদেরকে অতিক্ষুদ্র বা নগণ্য মনে হয়।

এ পৃথিবীতে কত উদ্ভিদ আছে তা সঠিক ভাবে বলা যাবে না। হিসেব করাও অসম্ভব। তবে কত রকমের উদ্ভিদ আছে তার একটা মোটামুটি হিসেব দেওয়া সম্ভব। অনুমান করা হয় যে বর্তমানে পৃথিবীতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষের মত। এই পাঁচ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ একটি থেকে অন্যটি ভিন্নতর। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের প্রতিটি প্রজাতিকে শনাক্ত করা সম্ভব।

পাঠ ১৪.১

উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উদ্ভিদের শ্রেণী বিন্যাসের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- উদ্ভিদের শ্রেণী বিন্যাসের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন;
- উদ্ভিদের একটি শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

শ্রেণীবিন্যাস

বিচিত্র ধরনের অসংখ্য উদ্ভিদরাজিকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একসাথে স্থাপনের নীতিমালায় পৃথিবীর সব উদ্ভিদকে কিংডম, বিভাগ, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি প্রভৃতি দল ও উপ-দলে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে বলা হয় শ্রেণীবিন্যাস।

বিচিত্র এ উদ্ভিদ জগতের সাথে আমাদের জীবন নিবিড়ভাবে জড়িত। অসংখ্য উদ্ভিদরাজির মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের উপকার করে থাকে আবার কোনটি অপকার করে। তবে বেশির ভাগ উদ্ভিদ আমাদের উপকার করে থাকে। প্রাচীনকালে মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখন তারা গাছপালার ফল, মূল ও লতাপাতাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত। এছাড়া তারা অসুখের পথ্য হিসেবে উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড, মূল ইত্যাদিকে ব্যবহার করত। তখন তারা উদ্ভিদকে আলাদা করে নিয়েছিল। কোনো উদ্ভিদ তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে, কোনটি ওষুধের কাজ করবে এবং কোনো উদ্ভিদ তাদের জন্য ক্ষতিকর। দিনে দিনে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জানা ও শেখার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তখন থেকে সুষ্ঠু শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা প্রকট হিসেবে দেখা দেয়।

শ্রেণীবিন্যাসের প্রকারভেদ

উদ্ভিদ জগতকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্ভিদবিদ ভিন্ন ভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন। এ সমস্ত শ্রেণীবিন্যাসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস, প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজনি শ্রেণীবিন্যাস। নিচে বেনথাম ও হুকারের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস আলোচনা করা হলো-

জর্জ বেনথাম (১৮০০-১৮৮৪) এবং স্যার জোসেফ ডালটন হুকার (১৮১৭-১৯১১), এ দুই ইংরেজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী তাঁদের "জেনেরা প্লান্টেরাম" নামক পুস্তকে এ শ্রেণীবিন্যাস প্রকাশ করেন।

বেনথাম ও হুকার সমস্ত উদ্ভিদ জগতকে প্রথমে দুটি উপ-জগতে ভাগ করেন। যথা-

উপ-জগত-- (ক) ক্রিপটোগ্যামিয়া বা বীজহীন অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং

উপ-জগত-- (খ) ফ্যানেরোগ্যামিয়া বা পুষ্পক উদ্ভিদ বা সবীজ উদ্ভিদ

ক্রিপটোগ্যামিয়া বা বীজহীন অপুষ্পক উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদে কখনো ফুল হয় না তারাই অপুষ্পক উদ্ভিদ। রেনু বা স্পোর দ্বারা এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে।

অপুষ্পক উদ্ভিদকে তাঁরা তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন।

বিভাগ ১ - থ্যালোফাইটা বা সমাঙ্গ বর্গ

বিভাগ ২ - ব্রায়োফাইটা বা মসবর্গ ও

বিভাগ ৩ - টেরিডোফাইটা বা ফার্ণ বর্গ

থ্যালোফাইটা বা সমাঙ্গ বর্গ : এ সব উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। এদেরকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) অ্যালগি বা শৈবাল ও খ) ফানজাই বা ছত্রাক

ব্রায়োফাইটা বা মসবর্গ : এ বিভাগে কতক উদ্ভিদকে নরম কাণ্ড ও পাতার মত অংশে বিভক্ত করা যায় এবং কতক উদ্ভিদ থ্যালোয়েড জাতীয়। উদাহরণ : *Ricua, Marchantia* ইত্যাদি।

টেরিডোফাইটা বা ফার্ণ বর্গ : এ বিভাগের উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। উদাহরণ : *Selaginella, Pteris* ইত্যাদি।

ফ্যানেরোগ্যামিয়া বা পুষ্পক উদ্ভিদ বা সবীজ উদ্ভিদ : এ উপজগতের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদের বীজ হয় তথা ফুল হয়। উদাহরণ : সাইকাস, আম, জাম ইত্যাদি।

এ উপ-জগতকে আবার দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়।

বিভাগ ১ - জিমনোস্পার্মি বা নগ্নবীজি (ব্যক্তবীজি) উদ্ভিদ ও

বিভাগ ২ - অ্যানজিওস্পার্মি বা আবৃতবীজি (গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।

জিমনোস্পার্মি বা নগ্নবীজি (ব্যক্তবীজি) উদ্ভিদ : এদের সত্যিকার কোনো ফুল হয় না, তবে এরা বীজ তৈরি করতে পারে। এদের ফল হয় না। উদাহরণ : সাইকাস, পাইনাস ইত্যাদি।

অ্যানজিওস্পার্মি বা আবৃতবীজি (গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ : এ সব উদ্ভিদের ফুল হয় এবং ফুলে গর্ভাশয় আছে, তাই ফল হয় এবং ফলের ভিতরে বীজ থাকে। উদাহরণ : আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

- বিচিত্র ধরনের অসংখ্য উদ্ভিদ রাজিকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একসাথে স্থাপনের নীতিমালায় পৃথিবীর সব উদ্ভিদকে কিংডম, বিভাগ, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি প্রভৃতি দল ও উপ-দলে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাস বলে।
- শ্রেণীবিন্যাস তিন প্রকার। যথা- কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস, প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজনি শ্রেণীবিন্যাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শ্রেণীবিন্যাস কত প্রকার?
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২. অপুষ্পক উদ্ভিদকে কয়টি বিভাগে বিভক্ত করা যায়?
ক. তিনটি খ. চারটি গ. দুইটি ঘ. পাঁচটি

৩. নিচের কোনটি অপুষ্পক উদ্ভিদ?
ক. আম খ. কাঁঠাল গ. লিচু ঘ. শৈবাল

৪. নিচের কোনটি মসবর্গের অন্তর্ভুক্ত?
ক. পেঁপে খ. নারিকেল গ. Riccia ঘ. Fungi

পাঠ ১৪.২

ভাইরাস (Virus)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভাইরাস এর বর্ণনা এবং এর রাসায়নিক গঠন বলতে পারবেন;
- ভাইরাসের আকৃতি, প্রকৃতি ও আয়তন বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভাইরাসের উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভাইরাস

কোষের সংগঠন অনুসারে উদ্ভিদ জগৎকে দুটি উপরাজ্যে (Sub-kingdom) ভাগ করা চলে। একটি উপরাজ্যকে বলে প্রোক্যারিওটস্ (procaryotes), আর অন্য উপরাজ্যটিকে বলে ইউক্যারিওটস্ (eucaryotes)। প্রোক্যারিওটসের কোষের গঠন, ইউক্যারিওটদের অপেক্ষা অনেক সরল। যে সমস্ত জীবের কোষের নিউক্লিয়াস সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা আবৃত নয়, সে সমস্ত জীবকে প্রোক্যারিওটস বা আদিকোষী জীব বলে।

ভাইরাস এক প্রকার অতি আণুবীক্ষণিক (ultra-microscopic) অকোষীয় সংখ্যাবৃদ্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু, যা কেবলমাত্র উপযুক্ত পোষক কোষে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং বিশেষ বিশেষ দেহে বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। উপযুক্ত পোষক কোষের বাইরে ভাইরাসে প্রাণের কোনো লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাসের ছবি তোলা যায়।

ভাইরাসের গঠন

বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসের গঠন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে ভাইরাসের গঠন নিম্নরূপ- প্রতিটি ভাইরাস প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। যথা-প্রোটিন আবরণ তথা ক্যাপসিড ও নিউক্লিক এসিড।

ক্যাপসিড (Capsid) : অপেক্ষাকৃত জটিল ভাইরাসে নিউক্লিক এসিডের বাইরে একে ঘিরে অবস্থিত প্রোটিন আবরণটি হলো ক্যাপসিড। এ প্রোটিন আবরণটি অসংখ্য প্রোটিন অণু দ্বারা গঠিত। ক্যাপসিড আবরণের এক একটি প্রোটিন অণুকে ক্যাপসোমিয়ার (capsomere) বলে। এ ক্যাপসোমিয়ার অণুসমূহ নির্দিষ্ট ভাইরাস নির্দিষ্ট ধরণের। কোনো কোনো প্রাণি ভাইরাসের ক্যাপসিডের বাহিরে একটি লিপোপ্রোটিনের স্তর থাকে এবং এর একককে পেপলোমার (pelpomer) বলে। এ ধরনের ভাইরাসকে লিপোভাইরাস (lipovirus) বলে।

কতকগুলি ভাইরাসের ক্যাপসিডের বাইরে প্লাজমা ঝিল্লীর স্তর থাকে। এতে ভাইরাসের অভিক্ষিপ্ত অঙ্গসমূহ সমান দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করে। এ সকল ভাইরাসকে মিক্সোভাইরাস (mixovirus) বলে।

নিউক্লিক এসিড (Nucleic Acid) : প্রতিটি ভাইরাস দেহের কেন্দ্রে অবস্থান করে নিউক্লিক এসিড। নিউক্লিক এসিড ভাইরাসের বংশগতি নির্ধারক পদার্থ। নিউক্লিক এসিড দু'ধরনের তথা- DNA (ডি অক্সি-রাইবো নিউক্লিক এসিড) ও RNA (রাইবো নিউক্লিক এসিড)।

উচ্চতর জীবের কোষে DNA ও RNA একত্রে থাকলেও সাধারণত ভাইরাসে DNA অথবা RNA থকে। সাধারণত উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA (ব্যতিক্রম Cauliflower Mosaic Virus-এ DNA থাকে) এবং প্রাণি ভাইরাসে DNA থাকে। নিউক্লিক এসিড ও তাকে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি

সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাসকে ভিরিয়ন (virion) বলে। সংক্রমণ ক্ষমতাহীন ভাইরাসকে বলা হয় নিউক্লিওক্যাপসিড।

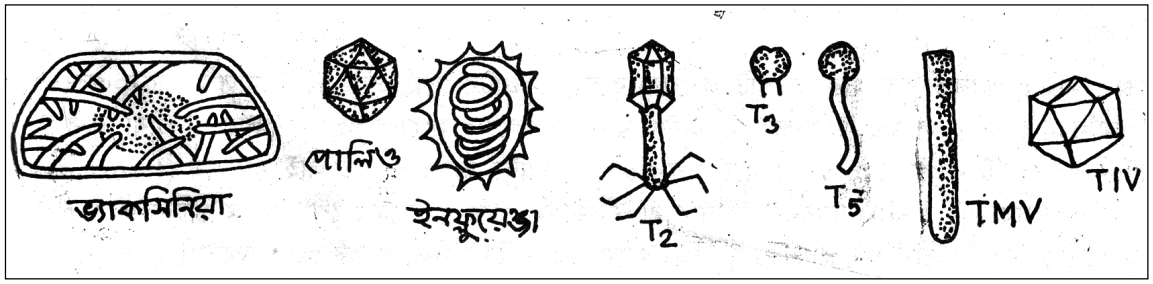

চিত্র ১৪.২-১ : বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসের গঠন

এখানে T_2 ব্যাকটেরিওফাজের গঠন আলোচনা করা হলো-

T_2 ব্যাকটেরিওফাজ : T_2 নামক ব্যাকটেরিয়াটি সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস এবং এটি একটি ব্যাঙাচি আকৃতির ভাইরাস। এর গঠন সম্বন্ধেও অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জানা হয়েছে। T_2 ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়; যথা- মাথা ও লেজ।

মাথা : মাথাটি ষড়ভূজাকৃতির। এর দৈর্ঘ্য ৯৩ মিলি মাইক্রন এবং প্রস্থ ৬৫ মিলি মাইক্রন। এর অভ্যন্তরে ফাঁপা অংশে, একটি দুই সূত্রবিশিষ্ট DNA প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে এবং চারিদিকে প্রোটিন অণু একত্রিত হয়ে আবরণের সৃষ্টি হয়।

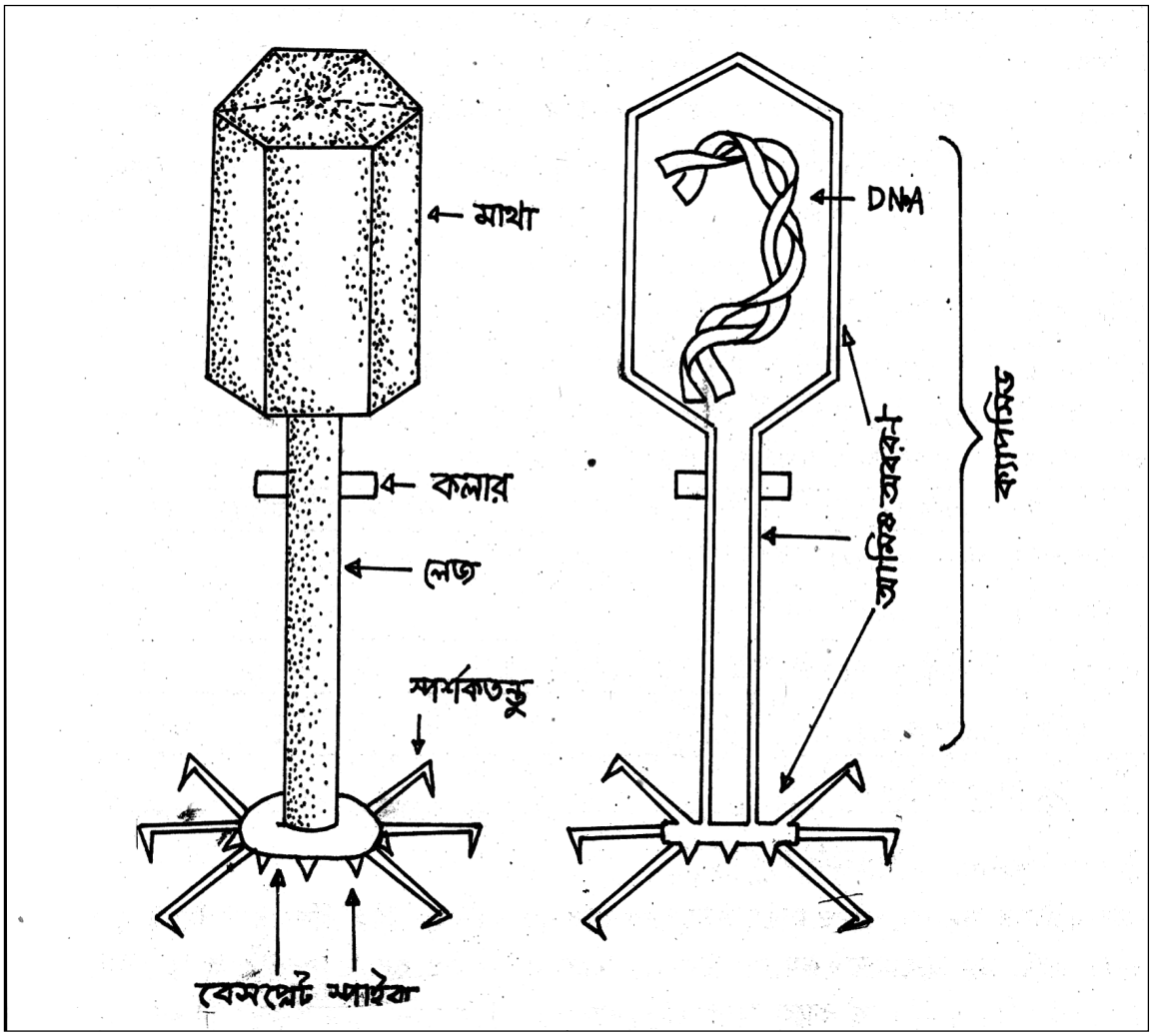

চিত্র ১৪.২-২ : T_2 ব্যাকটেরিওফাজের গঠন

লেজ : মাথার পরবর্তী লম্বা সরু অংশটিকে লেজ বলে। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মিলি মাইক্রন এবং প্রস্থ প্রায় ২৫ মিলি মাইক্রন। লেজের উপরিভাগকে অর্থাৎ মাথা ও লেজের সংযোগস্থলকে কলার বা গ্রীবা বলে। লেজের প্রোটিন আবরণটি ফাঁপা এবং এর বাহিরে সংকোচশীল প্রোটিন আছে। এতে লাইসোজোম (lysozyme) নামক পোষক কোষের (host cell) আবরণী বিনষ্টকারী এনজাইম থাকে। লেজের শেষ প্রান্তে ৬টি সূক্ষ স্পর্শকতন্তু বা লেজতন্তুযুক্ত একটি ভিত্তি ফলক (base plate) থাকে। এই ভিত্তি ফলকে কতকগুলি কাঁটা (prongs) বিদ্যমান। স্পর্শকতন্তুর সাহায্যে ভাইরাস পোষকের দেহে অবস্থান করে এবং কাঁটা দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে।

আকৃতি (Shape) : ভাইরাস বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। যেমন- গোলাকৃতি, দণ্ডাকৃতি, সূত্রাকৃতি, ব্যাঙাচি আকৃতি, বহুভূজাকৃতি, পাউরুটি আকৃতি ইত্যাদি।

প্রকৃতি (Nature) : উনবিংশ শতাব্দির ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভাইরাসের গঠন ও রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা ছিল না। পরবর্তীতে আলট্রাসেন্ট্রিফিউগেশন (Ultracentrifugation) পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়ফাজ পৃথক করা যায় এবং ভাইরাস সম্পর্কে অধিক জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

প্রকৃতপক্ষে ভাইরাসের প্রকৃতি জীবনের প্রকৃতিরই নামান্তর মাত্র। জীবজগতের প্রান্তসীমায় অবস্থিত এ ভাইরাস শুধু যে তাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকৃতির জন্যই স্বতন্ত্র তা নয় বরং এরা আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে- ভাইরাসকে পানিতে মেশানো যায় (suspension), ব্যাকটেরিয়া পৃথককরণে

ব্যবহৃত ছাঁকনির সাহায্যে ভাইরাস পৃথক সম্ভব নয়, সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথক করা যায় আবার রাসায়নিক পদার্থের মত কেলাসিত করা যায়। এ কেলাসিত ও বিশুদ্ধ প্রায় (para crystal) ভাইরাসকে সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের মতই কাঁচের বোতলে দীর্ঘদিন রাখা সম্ভব। এভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় ভাইরাসের প্রাণি কোনো লক্ষণই থাকে না।

কোনো কোনো ভাইরাসের উপাদানসমূহ পৃথক করে আবার সংযোজন সম্ভব হয়েছে। উপযুক্ত পোষক দেহে প্রবেশ করালে ভাইরাস অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে, যা কেবলমাত্র জীবন্ত বস্তুর পক্ষেই সম্ভব। তবে পোষক কোষের বাইরে ভাইরাস সাধারণত রাসায়নিক পদার্থের মতই নির্জীব। এ সকল কারণে অনেক বিজ্ঞানী ভাইরাসকে "জড় ও জীবের মধ্যকার যোগসূত্র" বলে অভিহিত করেছেন।

আয়তন (Size) : পৃথিবীর অসংখ্য প্রকার ভাইরাসের আয়তনও বিভিন্ন। ভাইরাস সাধারণত ১২ মিলিমাইক্রন (০.০১২ মাইক্রন, পোলিও ভাইরাস) হইতে ৩০০ মিলি মাইক্রন পর্যন্ত হয়ে থাকে। নিচে সারণী ১৪.১-১-এ কতকগুলি ভাইরাসের আয়তন উল্লেখ করা হলো-

	ভাইরাস	আয়তন (মিলি মাইক্রনে)
১.	হার্পিস (Herpes simplex)	১১০
২.	ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)	১১০
৩.	গোলআলুর মোজাইক ভাইরাস (Potato mosaic virus)	৪৩০ × ৯.৮
৪.	তামাকের মোজাইক ভাইরাস (Tobacco mosaic virus)	৩০০ × ১৮
৫.	পোলিও ভাইরাস (Polio virus)	১২

ছক ১৪.২-১: বিভিন্ন প্রকারের ভাইরাসের আয়তন

ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি (Replication of Viruses)

ভাইরাস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং গঠন প্রকৃতির দিক থেকে এতে জড় ও জীবের উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সংখ্যাবৃদ্ধি বা জননের ক্ষমতা ভাইরাসেও বিদ্যমান। যেহেতু শুধুমাত্র পরজীবী অবস্থাতে পোষকদেহের অভ্যন্তরেই ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে থাকে সেহেতু এদের বংশবৃদ্ধির সঠিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে T_2 নামক ব্যাকটেরিওফাজটির সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তারই আলোকে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা-

- পোষক কোষকে বিদ্ধকরণ বা সংক্রমণ
- ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডের প্রতিরূপ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক সংশ্লেষণ
- ভাইরাস উপাদানগুলির সংশ্লেষণ
- ভাইরাস উপাদানগুলির একত্রীকরণ ও পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কণার সৃষ্টি এবং
- পোষক-কোষ থেকে পরিণত ভাইরাসের নিষ্ক্রমণ বা লাইসিস।

পোষক কোষকে বিদ্ধকরণ বা সংক্রমণ : ভাইরাস-এর লেজ ও স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে পোষক ব্যাকটেরিয়ার (Escherichia coli) কোষ প্রাচীরে আটকে যায়। ভাইরাসটির লেজের মাথা যে স্থানে ব্যাকটেরিয়া কোষপ্রাচীর স্পর্শ করে সে স্থানে কিছু উৎসেচকের (Enzymes) আবির্ভাব হয় এবং এর ফলে কোষ প্রাচীরে একটি ছিদ্র প্রস্তুত হয়। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ভাইরাস নিউক্লিক এসিড (DNA) পোষক কোষে প্রবেশ করে এবং ভাইরাসের ক্যাপসিড বা প্রোটিন আবরণটি পোষক কোষের বাইরেই থেকে যায়।

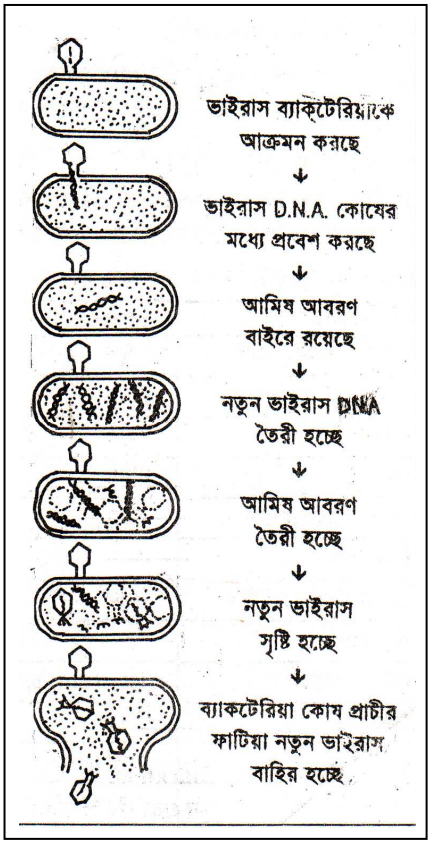

ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডের প্রতিরূপ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকের সংশ্লেষণ : পোষক কোষের ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন উৎসেচকের আবির্ভাবের ফলে পোষক কোষের ক্রোমোজোম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন ভাইরাসের নিউক্লিক এসিড পোষক কোষের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

ভাইরাসের উপাদনগুলির সংশ্লেষণ : এ পর্যায়টিকে ভাইরাস উপাদানগুলির প্রতিলিপি গঠন পর্যায় হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। এক্ষেত্রে ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডের নির্দেশক্রমে পৃথক পৃথকভাবে একদিকে নিউক্লিক এসিডের প্রতিলিপি অপরদিকে প্রোটিন আবরণ তৈরি হতে থাকে।

ভাইরাস উপাদানগুলির একত্রীকরণ ও পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কণা সৃষ্টি : ভাইরাস উপাদানগুলির প্রতিলিপি গঠন সমাপ্ত হবার সাথে সাথে এ পর্যায়ে ভাইরাস উপাদানগুলির একত্রীকরণ শুরু হয়। নিউক্লিক এসিডের এক একটি প্রতিলিপি এক একটি প্রোটিন আবরণ দ্বারা আবৃত হয় এবং উভয়ের ফলে এক একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কণার সৃষ্টি হয়।

wPÎ 14.2-3 : e¨vK‡UwiIdv‡Ri

পোষক-কোষ থেকে পরিণত ভাইরাসের নিমত্রণ বা লাইসিস : নতুন সৃষ্ট অপত্য ভাইরাসগুলি প্রয়োজনীয় সময়ের ব্যবধানে পরিণতি লাভ করে। পরিণত ভাইরাসের সংখ্যাধিক্যের কারণে পোষক কোষের প্রাচীর বিগলিত বা বিদীর্ণ হয়। ফলে ভাইরাসগুলি পোষক কোষ থেকে মুক্ত হয়। এটাকে লাইসিস পর্যায় বলে।

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance of viruses)

মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি ও উদ্ভিদ-দেহে ভাইরাস নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে থাকে। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব বা অকালমৃত্যুও হতে পারে। তবে ভাইরাস মানুষসহ অন্যান্য প্রাণির অনেক উপকার করে থাকে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভাইরাস মানুষের যত না উপকার করে থাকে, তা অপেক্ষা অধিক অপকার করে থাকে। নিচের ভাইরাসের উপকারিতা ও অপকারিতা উল্লেখ করা হলো।

ভাইরাসের অপকারিতা

ভাইরাস উদ্ভিদ, প্রাণি ও মানবকুলের অনেক ক্ষতি করে থাকে। যথা-

- মানুষের রোগ : ভাইরাস মানুষের বসন্ত, হাম, পোলিও, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, ভাইরাস হেপাটাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

- মানুষের অন্যান্য রোগ : মানুষের সর্বাপেক্ষা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বহুল আলোচিত এইডস্ (AID=Acquired Immune Deficiency Syndrome) এর জন্য ভাইরাসই দায়ী। HIV (Human Immune Deficiency) দিয়ে এইডস্ হয়ে থাকে। HIV দিয়ে আক্রান্ত রোগীর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়। ফলে মৃত্যু অবধারিত হয়।
- গৃহপালিত পশুর রোগ : গরুর বসন্ত, গরু, ভেড়া, ছাগল, শুকর, মহিষ ইত্যাদি প্রাণির "ফুট এ্যাণ্ড মাউথ" রোগ অর্থাৎ এদের পা ও মুখের বিশেষ ক্ষতরোগ ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে। এছাড়া কুকুর, বিড়ালের জলাতঙ্ক রোগ ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে।
- উদ্ভিদের রোগ : বিভিন্ন উদ্ভিদের মোজাইক রোগ, লিফরোল (পাতা কুঁচকানো রোগ), বুশিস্ট্যান্ট, ধানের টুংগ্রো রোগ ইত্যাদি প্রায় ৩০০ ধরনের রোগ ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে।
- ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস : মানুষের উপকারী কিছু ব্যাকটেরিয়াকে ভাইরাস ধ্বংস করে।
- ইবোলা ভাইরাস : ১৯৭৬ এবং ১৯৭৯ সালে এই ভাইরাস সৃষ্ট মহামারীতে আফ্রিকা মহাদেশের জায়ারে ও সুদানে শত শত লোক মারা যায়। এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুর হার শতকরা ৯০ ভাগ।

নিচে কয়েকটি ভাইরাস রোগের নাম, পোষক দেহ এবং ভাইরাসের নাম দেওয়া হলো-

রোগের নাম	পোষক দেহ	ভাইরাস
এইডস্ (লক্ষণ সমষ্টি)	মানুষ	HIV
মহামারী	মানুষ	ইবোলা
বসন্ত	মানুষ	ভেরিওলা
হাম	মানুষ	রুবিওলা
পোলিওমাইলাইটিস	মানুষ	পোলিও ভাইরাস
ইনফ্লুয়েঞ্জা	মানুষ	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস
ভাইরাল হেপাটাইটিস	মানুষ	হেপাটাইটিস-বি-ভাইরাস
গোবসন্ত	গরু	ভ্যাক্সিনিয়া
ফুট এণ্ড মাউথ	গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর	ফুট এণ্ড মাউথ ভাইরাস
মোজাইক	তামাক	তামাকের মোজাইক ভাইরাস (TMV)
বুশিস্টান্ট	টমেটো	টমেটো বুশিস্ট্যান্টি ভাইরাস
মোজাইক	শিম, শসা ইত্যাদি	মোজাইক ভাইরাস
টুংগ্রো	ধান	টুংগ্রো ভাইরাস

ছক ১৪.২-২ : বিভিন্ন ভাইরাসের নাম, পোষক দেহ এবং সৃষ্ট রোগের নামের তালিকা

ভাইরাসের উপকারিতা

বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে মানুষের কিছু উপকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যথা-

- **প্রতিষেধক প্রস্তুত** : বসন্ত, পোলিও, জন্ডিস এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরি করা হয়।

- **জীনতত্ত্ব ও আনবিক জীববিদ্যার গবেষণা :** ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত জীনতত্ত্ব ও আনবিক জীববিদ্যা বা জেনেটিক প্রকৌশলে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- রোগ প্রতিরোধ : ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়া জনিত আমাশয় রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে।
- **পোকামাকড় দমন :** অধুনা প্রযুক্তির হাতিয়ার রূপে কতিপয় ভাইরাস ব্যবহার করে কতিপয় ক্ষতিকর পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দমন সম্ভব হয়েছে।
- **বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ :** জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়া, অভিব্যক্তি ও ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার চাবিকাঠি হলো ভাইরাস, কেননা ভাইরাসে জীব ও জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

সারসংক্ষেপ

- ভাইরাস এক প্রকার অতি আনুবীক্ষণিক, সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষমতা সম্পন্ন বস্তু, যা কেবলমাত্র উপযুক্ত পোষক কোষে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং বিশেষ দেহে বিশেষ বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- ভাইরাস প্রোটিন আবরণ তথা ক্যাপসিড ও নিউক্লিক এসিডের সমন্বয়ে গঠিত।
- ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফাজ বলে।
- T_2 ব্যাকটেরিওফাজ প্রধানত দু'অংশে বিভক্ত, যথা- মাথা ও লেজ।
- ভাইরাসে জীব ও জড় উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এজন্য অনেকে ভাইরাসকে 'জড় ও জীবের মধ্যকার যোগসূত্র' বলে অভিহিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভাইরাস কোন ধরনের উদ্ভিদ?
   ক. অকোষীয় খ. এককোষীয়
   গ. দ্বিকোষীয় ঘ. বহুকোষীয়

২. ভাইরাস সাধারণত কি কি উপাদান দ্বারা গঠিত?
   ক. প্রোটিন খ. নিউক্লিক এসিড
   গ. ক্যাপসিড ঘ. প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড

৩. উদ্ভিদ ভাইরাসে সাধারণত কোন ধরণের নিউক্লিক এসিড থাকে?
   ক. DNA খ. DNA
   গ. DNA ও RNA ঘ. DNA বা RNA

৪. টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের আয়তন কত?
   ক. ২০০ × ১৫ মিলিমাইক্রন খ. ৩০০ × ১৫ মিলিমাইক্রন
   গ. ২৫০ × ১৮ মিলিমাইক্রন ঘ. ৩০০ × ১৮ মিলিমাইক্রন

৫. প্রাণি ভাইরাসে সাধারণত কোন ধরণের নিউক্লিক এসিড থাকে?
   ক. RNA খ. DNA ও RNA
   গ. DNA ঘ. DNA বা RNA.

পাঠ ১৪.৩

ব্যাকটেরিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাকটেরিয়া কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যাকটেরিয়ার গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা বলতে পারবেন;
- ব্যাকটেরিয়ার অপকারী দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

ব্যাকটেরিয়া কি?

ব্যাকটেরিয়া হলো সাধারণত ক্লোরোফিলবিহীন, প্রাককেন্দ্রীক (যাদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়) প্রাককোষী আণুবীক্ষণিক (যাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না) জীব। গাঠনিক উপাদান ও পুষ্টি পদ্ধতির জন্য ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলা হয়।

ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কার

পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব রয়েছে বহুপূর্ব হতে, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র না থাকার কারণে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু জানা যায় নি। তবে ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে ব্যাকটেরিওলজী ও প্লোটো-জুয়োলজীর জনক বলে পরিচিত অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক (Antony van Leeuwenhoock)-এর ডায়েরি ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের প্রথম দিনগুলির সাক্ষ্য বহন করে। হল্যাণ্ডের ডেলফ্‌ট (Delft) শহর নিবাসী বিজ্ঞানী লিউয়েনহুক ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তাঁর ডায়েরিতে যে বিবরণ লিখেছেন তাতে জানা যায় ঐ মাসের ৯ তারিখে তিনি একটি পাত্রে কিছু বৃষ্টির পানি ধরেছিলেন। ১০ তারিখে তিনি তাঁর স্বহস্তে নির্মিত সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে উক্ত পানিতে কিছু জীবন্ত বস্তু আছে বলে মনে করেন। কিন্তু সেগুলো এত ছোট ও সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে তিনি এটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। পরে ১১ জুন তারিখে পুনরায় ঐ পানি নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র আকৃতির জীব দেখতে পান। তিনি এগুলোর নাম দেন ক্ষুদ্রপ্রাণি বা (Animacutes)। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিকে লেখা লিউয়েন হুকের চিঠিতে ব্যাকটেরিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। পরে ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর রবার্ট হুক (Robert Hook) এবং নিয়ামী গ্রু (Nehemiah Grew) মরিচ ভিজানো পানি পরীক্ষা করে লিউয়েন হুকের আবিষ্কার প্রমাণ ও সমর্থন করেন।

ব্যাকটেরিয়ার নামকরণ

ব্যাকটেরিয়াম (Bacterium) শব্দটি গ্রীক ভাষা হতে উৎপত্তি। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে Ehernberg সর্বপ্রথম ব্যাকটেরিয়াম শব্দটি ব্যবহার করেন। ব্যাকটেরিয়াম (Bacterium) শব্দের অর্থ দণ্ড (Staff)। ব্যাকটেরিয়াম শব্দের বহুবচন ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) এবং জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট হুক (Robert Hock) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় স্বল্পজ্ঞাত অণুজীববিজ্ঞান আধুনিক অণুজীববিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্যাকটেরিয়া কোষের গঠন

বিভিন্ন জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার গঠন বিভিন্ন প্রকার। এখানে একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ার গঠন বর্ণনা করা হল।

ফ্লাজেলা : ব্যাকটেরিয়া কোষের মধ্য হতে উৎপন্ন হয়ে একপ্রকার প্রোটোপ্লাজম গঠিত সূত্রাকৃতির উপাঙ্গ কোষপ্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে আসে। একে ফ্লাজেলাম (বহুবচনে ফ্লাজেলা) বলে। ফ্লাজেলার সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া তরল মাধ্যমে চলাফেরা করে। ফ্লাজেলা অপেক্ষা খাটো ও শক্ত উপাঙ্গকে ফিমব্রী বলে। ব্যাকটেরিয়াকে কোনো কিছুর সাথে আটকে থাকতে ফিমব্রী সহায়তা করে।

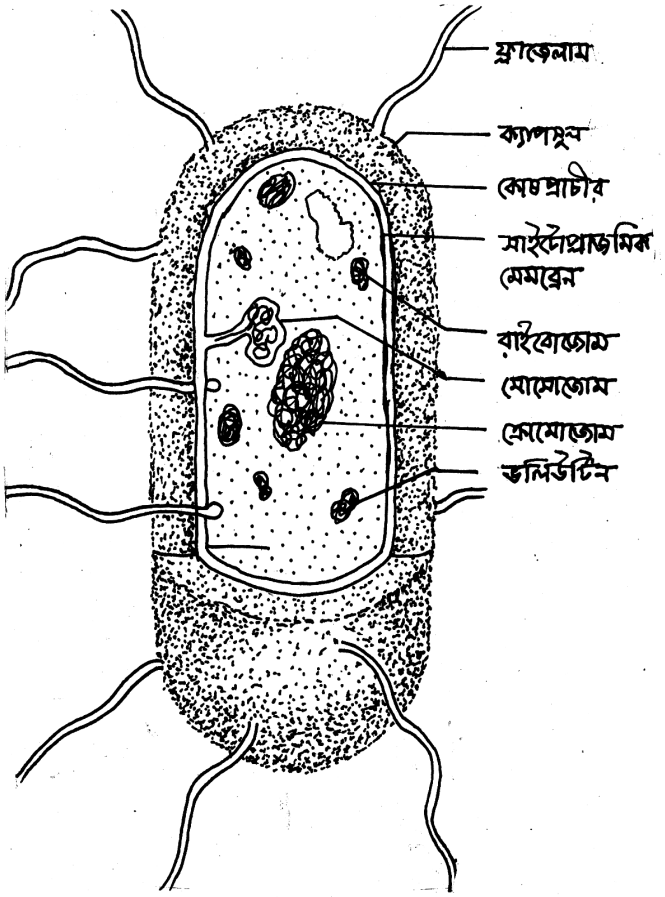

wPÎ 14.3-1 : GKwU mvwe©K e¨vK‡Uwiqv †Kvl
(AvswkK †Qw`Z `„k¨)

ক্যাপসুল : ক্যাপসুল পলিস্যাকারাইড বা পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত একটি স্তর, যা ব্যাকটেরিয়া কোষের বাইরের দিকে থাকে। এ স্তরকে স্লাইম স্তরও বলা হয়। কোনো কোনো সময় ক্যাপসুল অত্যন্ত পুরু আবরণের সৃষ্টি করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিকূল অবস্থা হতে রক্ষা করে।

কোষপ্রাচীর : ক্যাপসুলের নিচে কোষপ্রাচীর অবস্থিত। এটা প্রোটিন, লিপিড ও পলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত। কোষপ্রাচীর সাধারণত ১০-২৫ মিলিমাইক্রন পুরু হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া কোষের শতকরা ১০-৪০ ভাগ ওজন তার প্রাচীরের। এটি ব্যাকটেরিয়া কোষের নির্দিষ্ট আকার ও দৃঢ়তা প্রদান করে।

সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন : কোষপ্রাচীরের নিচে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন অবস্থিত। এটা প্রোটিন ও লিপিড দ্বারা গঠিত এবং কোষ-প্রাচীর হতে ভিন্ন। এ স্তরে অনেক এনজাইম আছে। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন স্তরটিতে পকেটের মত খাঁজ দেখা যায়। একে মেসোজম বলে।

সাইটোপ্লাজম : সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। এটি সাধারণত বর্ণহীন। এতে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন, ভলিউটিন ইত্যাদির উপস্থিতির ফলে সাইটোপ্লাজম দানাদার বলে মনে হয়। ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায়, সেগুলি নিম্নরূপ-

১. **রাইবোজোম** : সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র, প্রায় গোলাকার যে সমস্ত ফাঁপা পদার্থ দেখা যায় সেগুলি রাইবোজোম নামে পরিচিত। প্রতিটি রাবোজোম RNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। প্রোটিন সংশ্লেষণই এর কাজ।

২. **ক্রোম্যাটোফোর** : কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে সবুজ ও লালচে ধূসর বর্ণের রঞ্জক পদার্থ ব্যাকটেরিয়ার সালোক সংশ্লেষণে সাহায্য করে। এটি শুধুমাত্র সালোক সংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া সমূহে দেখা যায়।

৩. **গহ্বর** : ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর দেখা যায়। গহ্বরগুলি কোষরস দ্বারা পূর্ণ থাকে।

৪. **ভলিউটিন** : তরুণ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে ভলিউটিন থাকে। পুরাতন কোষে এসব ভলিউটিন দানা কোষ গহ্বরে স্থানান্তরিত হয়।

নিউক্লিয়াস : ব্যাকটেরিয়ার কোষে কোনো সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস নেই। নিউক্লিয়াস পর্দা ও নিউক্লিওলাস ব্যাকটেরিয়াতে অনুপস্থিত তবে কোষের প্রায় কেন্দ্রস্থলে নিউক্লিওয়েড অবস্থিত। একটি দুই সূত্র বিশিষ্ট DNA দ্বারা নিউক্লিওয়েড গঠিত। নিউক্লিয়াস পর্দা ও নিউক্লিওলাসের অনুপস্থিতির জন্য ব্যাকটেরিয়াকে প্রো-ক্যারিওটিক (প্রাককেন্দ্রীক) জীব বলা হয়।

ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন

ব্যাকটেরিয়া সাধারণত দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় (Binary Fission) বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এটি একটি অযৌন প্রকৃতির জনন। তবে এক্ষেত্রে কোনো প্রকার স্পোর উৎপাদন হয় না বলে এ প্রক্রিয়াকে অঙ্গজ জনন (Vegetative Reproduction)ও বলা হয়। নিচে ব্যাকটেরিয়ার জনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

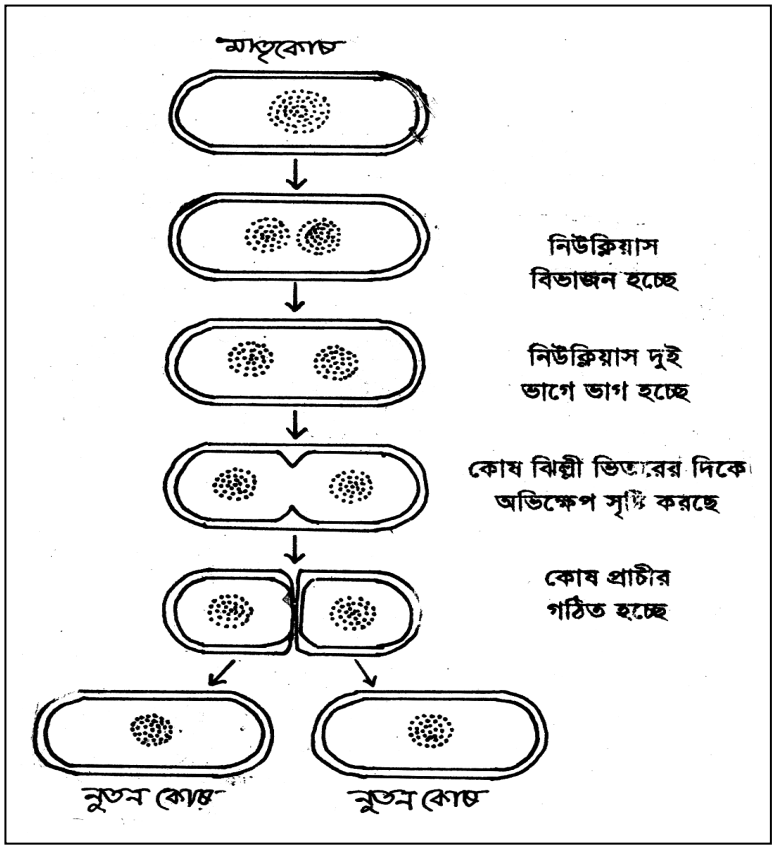

wPÎ 14.3-2 : wØ-fvRb cÖwµqvq e¨vK‡Uwiqvi eske„w×

দ্বিভাজন প্রক্রিয়া বা বাইনারি ফিশন (Binary Fission) : দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়াই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির স্বাভাবিক ও প্রধান উপায়। এটি অত্যন্ত সরল ও দ্রুততম জনন প্রক্রিয়া। আপাত দৃষ্টিতে একে অত্যন্ত সহজ প্রক্রিয়া মনে করা হলেও জীবাণুবিদ Dnaysi (১৯৫১) এর মতে এ প্রক্রিয়াটি তিনটি নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমিক ধাপের মাধ্যমে ঘটে।

প্রথমত : ব্যাকটেরিয়া কোষের মাঝামাঝি জায়গায় এর সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন ভিতরের দিকে বাড়তে থাকে এবং কেন্দ্রিকা বস্তুটিও বিভক্ত হতে থাকে এবং এই সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন একত্রিত হয়ে কোষটিকে দ্বিধাবিভক্ত করে। নবগঠিত কোষ দু'টির প্রত্যেকে কেন্দ্রিকা বস্তু লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, নতুন কোষ দু'টি পৃথকভাবে দু'টি পূর্ণাঙ্গ কোষে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত, নতুন সৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ কোষ দু'টি স্ফীতি চাপের ফলে পরস্পর হতে আলাদা হয়ে যায় এবং একটি ব্যাকটেরিয়াম হতে দু'টি ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়।

অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়াতে দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। নতুন সৃষ্ট কোষ দু'টি বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে এটি আবার বিভক্ত হতে পারে এবং এ কারণেই ডিপ্লোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এরূপ বিভাজনের জন্য সাধারণত ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় ব্যয় হয়।

২. যৌনজনন (Sexual reproduction) : ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জননের হার অত্যন্ত কম। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে লেডারবার্গ ও টেটাম (Lederbeg and Tetum) নামক গবেষকদ্বয় (Escherichia coli) নামক ব্যাকটেরিয়াতে সর্বপ্রথম যৌন জনন আবিষ্কার করেন। ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জনন প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে বংশগত বিষয়ক চরিত্রাবলির বিনিময় ও পুনর্বিন্যাস ঘটলেও ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না।

ব্যাকটেরিয়া কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড (n)। ব্যাকটেরিয়ার এ ধরনের জননের জন্য ভিন্ন চরিত্রবিশিষ্ট দু'টি কোষের প্রয়োজন। এদের একটি দাতা কোষ (+) (Donerau) এবং অন্যটি গ্রহিতা কোষ (-) (Recipientau) হিসেবে কাজ করে। দাতা কোষ ও গ্রহিতা কোষ দুটি পাশাপাশি চলে আসে এবং এদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন বা কনজুগেশন নালী সৃষ্টি হয়। এ কনজুগেশন নালীর মধ্য দিয়ে দাতা কোষের ক্রোমোজোম গ্রহিতা কোষে প্রবেশ করতে শুরু করে। তবে সাধারণত দাতা কোষের সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম গ্রহিতা কোষে স্থানান্তরিত হবার পূর্বেই কোষ দু'টির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে গ্রহিতা কোষ দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোজোম লাভ করে। আংশিক ক্রোমোজোম লাভ করে গ্রহিতা কোষে যে জাইগোট সৃষ্টি হয় তা আংশিক বা অসম্পূর্ণ জাইগোট। এই অসম্পূর্ণ জাইগোটকে মেরোজাইগোট (Merozygote) বলে। গ্রহিতা কোষের মেরোজাইগোটে দাতা কোষের (+) ক্রোমোজোম এবং গ্রহীতা কোষের (-) ক্রোমোজোমের মধ্যে রিকম্বিনেশন বা অংশের বিনিময় ঘটে এবং এরা পুনর্বিন্যাসিত হয়। অতিরিক্ত ক্রোমোজোম বিলুপ্ত হয়। এরপর গ্রহীতা কোষটি দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। এ প্রক্রিয়ায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিনিময় ঘটলেও কোনো প্রকার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না বরং দাতা কোষটি আংশিক ক্রোমোজোম হারিয়ে অচিরেই বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

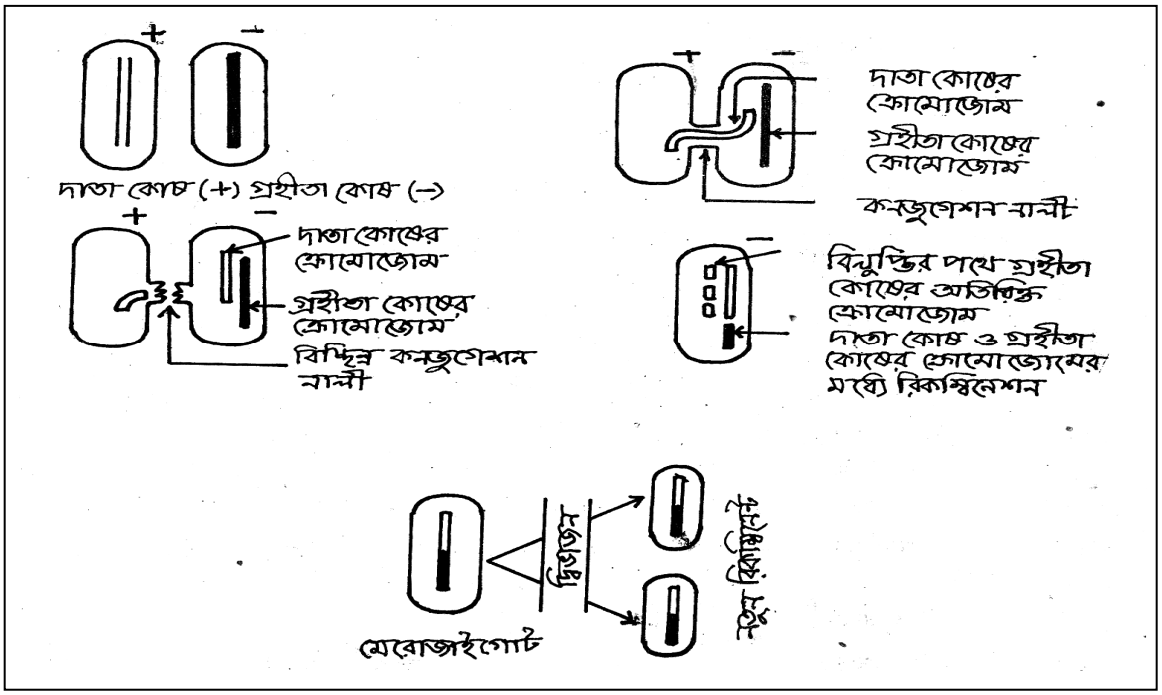

চিত্র ১৪.৩-৩ : ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়

যৌন জনন প্রক্রিয়া ছাড়াও দ্রবণীয় DNA-এর সাহায্যে (যাকে ট্রান্সফর্মেশন প্রক্রিয়া বলে), ভাইরাসের মাধ্যমে (যাকে ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়া বলে) ও প্লাজমিড নামক বিশেষ এক প্রকার বস্তুর সাহায্যে ব্যাকটেরিয়াতে চারিত্রিক গুণাবলির স্থানান্তরণ ও পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে।

প্রতিকূল অবস্থায় একটি ব্যাকটেরিয়ামের প্রোটোপ্লাস্ট হতে একটি মাত্র স্পোর উৎপন্ন হয়। এ স্পোরের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে এবং অনুকূল পরিবেশে এটা থেকে একটি মাত্র ব্যাকটেরিয়ামের সৃষ্টি হয়।

এছাড়া কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে বাডিং (Budding) প্রক্রিয়ায়, কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে শাখা উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে কনিডিয়া (Conidia) উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, আবার কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে গনিডিয়া (Gondia) দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে।

ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার-অপকার দুটোই করে থাকে। সাধারণত এদের ক্ষতিকর কার্যকলাপই আমাদের চোখে ধরা পড়ে বলে আমরা ব্যাকটেরিয়াকে শত্রু বলে মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়া আমাদের অনেক উপকারও করে থাকে।

ব্যাকটেরিয়ার উপকারীতা

এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরিতে : অধিকাংশ এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ এ্যাকটিনোমাইসিটিস জাতীয় অণুজীব হতে উৎপন্ন হলেও ব্যাকটেরিয়া হতেও কিছু প্রয়োজনীয় এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরি করা হয়। যথা-

ব্যাকটেরিয়া	এ্যান্টিবায়োটিক
Hacillus subtilis	সাবটিলিন
Bacillus Polymyka	পলিমিক্সিন

প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন তৈরিতে : ভাইরাসের মত ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যেও কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত করা হয়।

এছাড়া ডিপিটি (DPT), ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও ধনুষ্টংকার রোগের প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত করা হয়।

চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ : চা, কফি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চামড়া শিল্পে : চামড়া হতে লোম ছাড়ানো ও চামড়াকে নমনীয়করণের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেয়া হয়।

পাটের আঁশ ছাড়ানো : পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হয়। এ পাটের পৃথকীকরণে ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাটের আঁশ পৃথকীকরণে পাটকে পানিতে জাগ দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে আঁশ পৃথক করতে বায়বীয় ও অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে পাটের আঁশ পৃথককরণের বিকল্প পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

ভিটামিন প্রস্তুতিতে : মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী Escherichiacoli (E coli), Aerobacta aevegenes এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াগুলি ভিটামিন 'বি', থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন, নিকোটিনিক এসিড, প্যান্টোথেনিক এসিড, বায়োটিন, ফলিক এসিড, ভিটামিন-কে ইত্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে।

আবর্জনা পচনে : উদ্ভিদ ও প্রাণির মৃতদেহ এবং নানাবিধ জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার সাধন করে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে জীবের মৃতদেহের পচন না ঘটলে সমস্ত পৃথিবী মৃতদেহের স্তূপে পরিণত হত এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ আমাদের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত। ব্যাকটেরিয়ার এ পচন ক্রিয়ার কারণেই পুঁতিগন্ধময় মৃত জীবদেহ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিদূরিত হয় বলেই ব্যাকটেরিয়াকে প্রাকৃতিক ঝাড়ুদার (Natural scarenger) বলা হয়।

সেলুলোজ হজমে : গবাদি পশু ঘাস, খড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এদের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। গবাদি পশুর অন্ত্রে অবস্থিত এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া ঘাস, খড়ের প্রধান অংশ সেলুলোজ হজম করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতি : দুধ থেকে দই, মাখন, পনির প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুতে ব্যাকটেরিয়া প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। এ সকল খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ ব্যাকটেরিয়ার গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ : ময়লা, আবর্জনা, মলমূত্র ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো নর্দমার পানিকে দূষণমুক্ত এমনকি পুন ব্যবহার উপযোগী করতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি : মাটির উর্বরতায় ব্যাকটেরিয়ার অবদান অনেক বেশি। মৃত গাছপালা ও প্রাণিদেহের পচন, বিগলন ও পরিশেষে বিভিন্ন সরল উপাদানে পরিণত করতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

নাইট্রোজেন সংবন্ধন : বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেন উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সরাসরি কাজে লাগে না। মাটিতে বসবাসকারী কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন- Azotbacter, pscudomonas, clostridium প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া সরাসরি বায়ু হতে নাইট্রোজেন ধরে নাইট্রোজেন যৌগ হিসেবে মাটিতে স্থাপন করে। ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলগুটিকার (Nodull) বসবাসকারী সহবাসী (Symbiotic) ব্যাকটেরিয়া (যথা- Rliznbium/Bacillus প্রজাতি) বায়ুস্থ গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে নাইট্রেট যৌগে পরিণত করে, ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে : প্রাকৃতিক গ্যাস তথা মিথেন, বিউটেন প্রভৃতি জ্বালানি গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার উপযোগী করতে নানাবিধ ব্যাকটেরিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

কীট পতঙ্গের বায়োলজিক্যাল নিয়ন্ত্রণে : কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া লেপিডোটেরা (Lepidoptera) ও অন্যান্য পতঙ্গের লাভা আক্রমণ করে এবং সেগুলোকে সমূলে বিনষ্ট করে। Bacillus thuringiensis নামক ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

তেল অপসারণে : সমুদ্রের পানিতে ভাসমান তেল অপসারণে তেল খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা বা ক্ষতিকারক কার্যাবলি

মানুষের রোগ সৃষ্টিতে : ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এ সকল রোগ সাময়িক অসুস্থতা, দুর্বলতা, পঙ্গুত্ব বা অকাল মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। নিচে মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও রোগের নাম উল্লেখ করা হলো-

রোগের নাম	রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া
কলেরা	*Vibrio Cholerac*
টাইফয়েড	*Salmonella typhi*
যক্ষ্মা	*Mycobacterium tuberculosis*
আমাশয়	*Bacillus dysenteri*

টিটেনাস	*Clostridium tetani*
কুষ্ঠ (লেপরসী)	*Mycobacterium leprae*, ইত্যাদি

গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টি : ব্যাকটেরিয়া গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণিদেহে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। নিচে গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণিদেহে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম ও সংশ্লিষ্ট রোগের নাম উল্লেখ করা হলো-

রোগের নাম	রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া
গরু-মহিষের যক্ষ্মা	*Mycobacterium bovis*
হাঁস-মুরগির কলেরা	*Bacillus antisepticus*
ইদুঁরের প্লেগ	*Yersinia pestis,* ইত্যাদি

উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিতে : ব্যাকটেরিয়া ফসলী উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি করে। এর ফলে ফসলের ফলন অনেক কমে যায়। নিচে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ রোগ ও সংশ্লিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার নাম উল্লেখ করা হলো-

উদ্ভিদের নাম	রোগের নাম	রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া
ধান	পাতা ধ্বসা (leaf blight)	*Xanthomonas oryzae*
গম	টুণ্ডু (Tundu)	*Agrobacterium tritici*
আলু	বাদামী পঁচা (Brown Pot)	*Pseudomonas solanacearum*
আখ	আঠা ঝারা (Gummosis)	*Xanthomonas vasculorum*
টম্যাটো	ক্যাঙ্কার (Canker)	*Corynebacterium michiganense,* ইত্যাদি

খাদ্য দ্রব্যের বিষাক্তকরণে : ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি আমাদের নানাবিধ খাদ্যের বিষাক্তকরণের মাধ্যমে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি করে থাকে। কাঁচা অথবা রান্না করা মাছ, মাংস, শাকসবজি, ডাল, পাকা ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পঁচে যায় এবং অনেক সময় বিষাক্ত দ্রব্যে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে Clostridium botulinum নামক ব্যাকটেরিয়া খাদ্যে বটিউলিন (botulin) নামক বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং এ বিষাক্তযুক্ত খাদ্য খেলে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

মাটির উর্বরতা বিনষ্টে : নাইট্রেট জাতীয় উপাদান মাটিকে উর্বর করে থাকে। কতিপয় নাইট্রেট বিশ্লেষক ব্যাকটেরিয়া মাটিতে অবস্থিত নাইট্রেটকে বিনষ্ট করে। এর ফলে নাইট্রেট থেকে বায়বীয় নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়।

পানি দূষণে : বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া পানি দূষিত করে এবং দূষিত পানি নানা প্রকার রোগ জীবাণু সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগ দূষিত পানি পানের ফলে হয়ে থাকে। কলিফর্ম, ফেকাল কলিফর্ম, Samonella shigella Baullus Eschericha coli. প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া পানি দূষিতকরণের জন্য দায়ী।

যুদ্ধে ক্ষতিকারক জীবাণুর ব্যবহার মানব জাতীর জন্য হুমকি স্বরূপ।

- ব্যাকটেরিয়া হলো সাধারণত ক্লোরোফিলবিহীন, প্রাক্‌কেন্দ্রীক, এককোষী আণুবীক্ষণিক জীব। ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষপ্রাচীর জটিল প্রকৃতির। এদের জটিল কোষ প্রচীর তিন অংশে বিভক্ত। যথা- ক্যাপসুল কোষপ্রাচীর ও সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন।
- ব্যাকটেরিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোম, ক্রোম্যাটোফোর, গহ্বর, ভলিউটিন, মেসোজোম ইত্যাদি থাকে।
- ব্যাকটেরিয়া সাধারণত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে।
- জীবন রক্ষাকারী এ্যান্টিবায়েটিক ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত হয়।
- ব্যাকটেরিয়া মৃত জীব ও আবর্জনা পচনের মাধ্যমে এ পৃথিবী পৃষ্ঠকে বাসের উপযোগী করে তুলেছে।
- নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকে।
- ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ, প্রাণি ও উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ব্যাকটেরিওলজীর জনক কাকে বলা হয়?
ক. লুই পাস্তুর খ. অ্যান্টিনি ভন লিউয়েন হুক
গ. ওয়াকসম্যান ঘ. স্প্যালাঞ্জানী

২. ব্যাকটেরিয়া শব্দের অর্থ?
ক. গোলাকৃতি খ. প্যাঁটানো আকৃতি
গ. দণ্ড ঘ. কমা আকৃতি

৩. ব্যাকটেরিয়ার জটিল কোষ প্রাচীর কয়টি অংশে বিভক্ত?
ক. এক খ. তিন
গ. দুই ঘ. চার

৪. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াসে কোন ধরণের নিউক্লিক এসিড থাকে?
ক. DNA খ. RNA
গ. DNA/RNA ঘ. DNA ও RNA

৫. ব্যাকটেরিয়া সাধারণত কোন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে?
ক. যৌন জনন খ. বাডিং গ. দ্বি–ভাজন ঘ. স্পোর সৃষ্টি

৬. "সাবটিলিন" নামক এ্যান্টিবায়োটিক নিচের কোন ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা হয়?
ক. *Bacillus polymyxa* খ. *Bacillus subtilis*
গ. *Bacillus sphericus* ঘ. *Bacillus licheniformis*.

পাঠ ১৪.৪

থ্যালোফাইটা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ছত্রাকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- অ্যাগারিকাস-এর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন;
- শৈবালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন;
- স্পাইরোগাইরা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- শৈবালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখতে পারবেন;
- লাইকেন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- লাইকেনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

থ্যালোফাইটা বা সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ

এ দলের উদ্ভিদগুলো এককোষী বা বহুকোষী, ক্লোরোফিলবিশিষ্ট বা ক্লোরোফিলবিহীন, শাখা-প্রশাখাযুক্ত বা শাখা-প্রশাখাবিহীন। এসব উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এদের থ্যালাস আকৃতি অর্থাৎ এরা মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত থাকে না। এদেরকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। যথা শৈবাল ও ছত্রাক। তবে শৈবাল ও ছত্রাকের সমন্বয়ে মিথোজীবি এক প্রকার থ্যালোফাইটার জন্ম হয়, একে লাইকেন বলে।

নিচে ছত্রাক, শৈবাল ও লাইকেন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ছত্রাক (Fungi)

ফাংগাস বহুবচনে ফাংজাই একটি ল্যাটিন শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'মাশরুম' বা ব্যাঙের ছাতা সদৃশ বস্তু। ফানজাই বা ছত্রাক এমন একটি উদ্ভিদ গোষ্ঠী যারা বিভিন্ন পরিবেশে মৃতজীবী অথবা পরজীবী হিসেবে বসবাস করে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এদের সকলেই আমাদের আর্থিক ক্ষতি সাধন করে না, অনেক ছত্রাক আমাদের প্রভূত উপকার করে থাকে। এরা এককোষী সরলতম গঠন থেকে শুরু করে বহুকোষী জটিল দেহের অধিকারী।

ছত্রাকেরা উদ্ভিদ জগতের অধীন এক প্রকার ক্লোরোফিল বিহীন জীবসম্প্রদায়। সবুজ উদ্ভিদের ন্যায় ছত্রাকের কোষ সুগঠিত।প্রকৃত নিউক্লিয়াস এবং স্বতন্ত্র কোষপ্রাচীর বিদ্যমান। ছত্রাকের অঙ্গজদেহ থ্যালাসের ন্যায়, এরা উচ্চবর্গের উদ্ভিদের ন্যায় মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত নয়। ছত্রাকের কোষদেহে প্রকৃত নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য কোষ অঙ্গানু বর্তমান থাকায় সকল ছত্রাকই ইউক্যারিওট প্রকৃতির।

ছত্রাকের অঙ্গজদেহ লম্বা সুতার মত নালীকা বা হাইফি (Hyphae), একবচনে হাইফা (hypha) দিয়ে গঠিত। এসব প্রচুর শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হয়ে পরস্পরের সাথে একত্রে অবস্থান করে একটি জটের সৃষ্টি করে, একে

মাইসেলিয়াম (Myalium), বহুবচনে মাইসেলিয়া (Myatia) বলে। ছত্রাকের হাইফাগুলি আবার দু'ধরনের। কিছু কিছু ছত্রাকের হাইফাতে আড়াআড়ি প্রাচীর (Crosswall) দেখা যায়, এদেরকে বলা হয় সেপটা (septum), একবচনে (septum)। যে সব হাইফাতে সেপটা উপস্থিত তাকে মনে করা হয় একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত এবং যে ক্ষেত্রে হাইফাতে কোনো সেপটা থাকে না, সেক্ষেত্রে তাকে মনে করা হয় এককোষী বলে। যেহেতু সেপটাবিহীন ছত্রাক দেহ কম জটিল তাই এসব ছত্রাককে উল্লেখ করা হয় নিম্নস্তরের ছত্রাক (lower fungi) হিসেবে। আর সেপটা যুক্ত হাইফা বিশিষ্ট ছত্রাককে উচ্চ স্তরের ছত্রাক (Meagu fung) হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ছত্রাকের কোষপ্রাচীর প্রধানত কাইটিন দিয়ে গঠিত, তবে কোনো কোনো সময় সেলুলোজ বা বিভিন্ন প্রকার পলিস্যাকারাইড অথবা সেলুলোজ ও কাইটিন একত্রে উপস্থিত থাকতে পারে। এদের কোষের প্রোটোপ্লাজম দানাদার বা জালিকাকার, কোষে কোষগহ্বর বা ভ্যাকুউল (Vacuoles) থাকে। এদের কোষের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন, তবে অনেক ছত্রাকের কোষে ম্যানিটল, তৈল বিন্দু ও প্রোটিন সঞ্চিত খাদ্যরূপে থাকতে পারে।

ছত্রাকের স্পোর থেকে অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে এক বা একাধিক সরু ছোট হাইফার সৃষ্টি হয়। এসব হাইফা পর্যায়ক্রমে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে নালিকা বা ছত্রাকের মাইসেলিয়াস সৃষ্টি করে। ছত্রাকে সাধারণত তিন ধরনের জনন দেখা যায়, যথা- অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন এবং যৌন জনন।

ছত্রাক (Agaricus)

আবাস

Agaicus একটি মৃতজীবী ছত্রাক। এদের প্রজাতিগুলি মাংসল (Heshy) বা গিল gill ছত্রাক নামে পরিচিত। Agariues ভেজা মাটিতে, কাঠের উপরে, পঁচা সারের গাদা, খড়ের গাদা, গোবর প্রভৃতির উপর জন্মে। বৃষ্টির দিনে এরা অধিক পরিমাণে জন্মায়। অনেক সময় সবুজ ঘাসের বনে Agaricus-এর কোনো কোনো প্রজাতি দলবদ্ধভাবে একটি বৃত্তের আকারে অবস্থান করে। এ ধরনের বৃত্তকে পরিচক্র (Fairy ring) বলে।

বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে যখন তারা স্পোর উৎপাদন করে তখন স্পোর উৎপাদক বিশেষ অঙ্গটি (Fruiting body) খাড়াভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে। পরিণত অবস্থায় এ স্পোর উৎপাদক অঙ্গটি অনেকটা ছাতার মত দেখায় তাই সাধারণভাবে এ ছত্রাক প্রজাতিগুলিকে ব্যাঙের ছাতা (Mushroom) বলা হয়।

গঠন

Agaricus-এর দেহটি দুটি অংশে বিভক্ত। যথা- দৈহিক অংশ তথা মাইসেলিয়াম ও জনন অংশ তথা ফ্রুটিং বডি।

ব্যাসিডিওরেণুর অঙ্কুরোদগমের ফলে সৃষ্ট প্রাথমিক মাইসেলিয়াম হতে Agaricus-এর অঙ্গজ মাইসেলিয়ামের সৃষ্টি হয়। মাইসেলিয়াম অধিক শাখা-প্রশাখা যুক্ত, আলগাভাবে জট পাকানো এবং ভেজা মাটি বা জৈব পদার্থের ভিতরে অবস্থিত। মাইসেলিয়াম সৃষ্টিকারী হাইফাগুলি প্রস্থ-প্রাচীরযুক্ত। হাইফাগুলি সাদা বর্ণের এবং এরা আবাসস্থল থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে।

হাইফার কোষগুলিতে অসংখ্য নিউক্লিয়াস, দানাদার সাইটোপ্লাজম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্যাকুওল এবং সঞ্চিত খাদ্যরূপে তৈলবিন্দু থাকে। হাইফার মাইসেলিয়ামগুলি অনেক সময় ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে দড়ির মত গঠন সৃষ্টি করে, একে রাইজোমর্ফ (rhizomorpl) বলে।

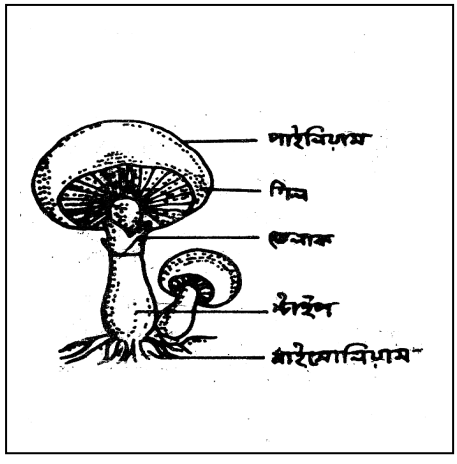

চিত্র ১৪.৪-১ : Agaricus ছত্রাক

Agaricus-এর কতিপয় প্রজাতির মৃদগত মাইসেলিয়াম একটি কেন্দ্রীয় বিন্দু হতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চারিদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। পরিণত অবস্থায় এ প্রকার মাইসেলিয়ামের হাইফাগুলির অগ্রভাগ হতে ব্যাসিডিওকার্প উৎপন্ন হয়ে মাটির উপরে উঠে আসে। উৎপন্ন ব্যাসিডিওকার্পগুলি একটি চক্রের মতো দেখায় বলে একে পরিচক্র বা (fairyring) বলে।

Agaricus-এর বায়ব ও দৃশ্যমান অংশটি ব্যাসিডিওকার্প নামে পরিচিত। সাধারণভাবে একে ফল দেহ (Fuuiting body)-ও বলা হয়। পরিণত অবস্থায় ব্যাসিডিওকার্পটি দুটি অংশে বিভেদিত। যথা-নিচের বেলনাকার বৃন্ত সদৃশ অংশটির নাম স্টাইপ (Stide) ও উপরের ছাতার ন্যায় অংশটির নাম পিলিয়াস (Piles)।

সুতার মত সরু এবং চওড়া ও স্ফীত এ দু'ধরনের হাইফা দিয়ে স্টাইপটি গঠিত। স্টাইপের নিচের দিকে ক্রমশ: সরু হয়। স্টাইপের উপরের দিকে একটি আংটির ন্যায় ভঙ্গুর ও সরু অংশ থাকে, একে বলয় (annulus) বলে। স্টাইপের অগ্রভাগে অবস্থিত ছাতার ন্যায় অংশটিকে পিলিয়াস (Piteus)। প্রকৃতপক্ষে এটি ব্যাসিডিওকার্পের একটি প্রসারিত অংশ। পরিস্ফুটনের প্রথম অবস্থায় পিলিয়াসের উপরিভাগ উত্তল (convex) থাকে এবং পরিণত অবস্থায় চ্যাপ্টা হয়ে যায়। পিলিয়াসের উপরিতল পাতলা, শুষ্ক, মসৃণ, সাদা বা হালকা পিঙ্গল বর্ণের হয়। ব্যাসিডিওকার্পের এ অংশটিকে মাংসল অংশ (flesh) বলে। পিলিয়াসের কিনারা অখণ্ড বা ঢেউযুক্ত থাকতে পারে। পিলিয়াসের নিম্নতলে গোলাপী বা লোহিত পিঙ্গল বর্ণের পাতলা, পরস্পর তবে পৃথক কতকগুলি পাতের ন্যায় অংশ থাকে, এদেরকে ল্যামেলী (lamellac) বহুবচনে-ল্যামেলা (lamella) বা গিল (gill) বলে। ল্যামেলী বা গিলগুলি স্টাইপ ও পিলিয়াসের সংযোগ স্থল হতে উৎপন্ন হয়ে পিলিয়াসের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এক সময় মনে করা হতো ছত্রাক আমাদের কেবলমাত্র ক্ষতিসাধন করে থাকে। পরবর্তীতে এর উপকারী দিকগুলো আবিষ্কৃত হয়।

পাউরুটি, দই, পনির প্রভৃতি শিল্পে ছত্রাক ব্যবহৃত হয়। পাউরুটি শিল্পে ব্যাপকভাবে ঈষ্ট জাতীয় ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। পনির আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত না হলেও উন্নত দেশে খাদ্য হিসেবে ইহা বহুল ব্যবহৃত হয়। দুধ থেকে পনির তৈরিতে ছত্রাক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ছত্রাক থেকে এন্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়। স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে Penicillium notatum থেকে সর্বপ্রথম পেনিসিলিন নামক এন্টিবায়োটিক তৈরি করেন। প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হিসেবে ছত্রাক ব্যবহৃত হয় যেমন- মাশরুম। ছত্রাক আমাদের এতকিছু উপকার করলেও এটা অনেক ক্ষতির কারণও বটে। ছত্রাক উদ্ভিদে অনেক রোগ সৃষ্টি করে। যেমন- ধান গাছের হেলমিনথোস্পোরিয়াম জনিত, আলুর ফাইটোপথোরা জনিত, গম গাছের পাকসিনিয়া ও উস্টিলাগো জনিত রোগ ইত্যাদি। এছাড়া ছত্রাক মানুষসহ অন্যান্য প্রাণির ত্বক, যকৃত, ফুসফুস, নাক, কান, গলা ও পা প্রভৃতি অঙ্গে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

শৈবাল (Algae)

অ্যালজী (Algae) একবচনে অ্যাল্‌গা (Alga) অর্থাৎ শৈবাল "থ্যালোফাইটা" বা সমাঙ্গদেহী বিভাগের অন্তর্গত ক্লোরোফিলসমন্বিত একপ্রকার প্রাচীনতম ও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ। শৈবালের দেহ থ্যালাসের ন্যায় কিন্তু দেহকোষে ক্লোরোফিল থাকাতে এরা সর্বদাই স্বভোজী, অর্থাৎ আলোকের উপস্থিতিতে এবং পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহায়তায় এরা নিজেদের দেহকোষে কার্বহাইড্রেট প্রস্তুত করতে সক্ষম।

কখনও এককভাবে কখনও দলবদ্ধভাবে নালা-নর্দমা, পুকুর, হ্রদ, নদী, সাগর এককথায় পৃথিবীর সমস্ত জলাশয়ে ছড়িয়ে রয়েছে শৈবালের প্রায় ত্রিশ হাজার প্রজাতি। মুক্ত, ভাসমান অথবা নিমজ্জিত হিসাবেই এদের সাধারণত বসবাস করতে দেখা যায়, তবে শৈবালের অনেক প্রজাতি মাটি, পাথর, গাছের বাকলের উপরও জন্মে। শৈবালের অনেক প্রজাতি পরাশ্রয়ী, মিথোজীবী এবং আন্তঃবাসী হিসাবে জন্মে।

স্পাইরোগাইরা(Spirogyra)-এর দৈহিক গঠন

Spirogy দেখতে আঁশের মত চিকন, সুতাকৃতি (filamentouj), শাখা- প্রশাখা বিহীন, লম্বা বহুকোষী শৈবাল। একটির পর একটি কোষ লম্বালম্বিভাবে সংযুক্ত হয়ে একটি ফিলামেন্ট গঠন করে। ভাসমান Spirogyra-র প্রত্যেকটি কোষ একই রকম হওয়ায় এদের আগা ও গোড়া চিহ্নিত করা কষ্টকর হয়। অঙ্কুরোদগমের পর এদের পশ্চাৎ প্রান্তীয় কোষ বন্ধক বা হোল্ডফাস্ট (hold fast) এ পরিণত হয় এবং কোনো অবলম্বনের সাথে আটকে থাকে। ফলে সংযুক্ত Spirogyra-র আগা গোড়া চিহ্নিত করা যায়।

Spirogyra-এর দেহসূত্রের প্রতিটি কোষ তিনস্তর বিশিষ্ট কোষপ্রাচীর দ্বারা আবৃত। কোষ প্রাচীরের ভিতরের দুটি স্তর সেলুলোজ ও বাহিরের স্তরটি পেকটোজ দ্বারা গঠিত। বাহিরের স্তরটি পানির সংস্পর্শে এসে দ্রবীভূত হয় বলে উদ্ভিদটি পিচ্ছিল হয়ে পড়ে এবং এদেরকে হাত দিয়ে ধরলে পিচ্ছিল মনে হয়।
কোষ প্রাচীরের ভিতরের প্রাচীর সংলগ্ন সাইটোপ্লাজমের একটি পাতলা স্তর আছে। এ স্তরের পরেই একটি বড় কোষগহ্বর (Vkcuole) বিদ্যমান। কোষ বড় হলে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কোষগহ্বর তৈরি হয়, ফলে কোষের ভিতরে বেশ কিছু অংশ ফাঁকা দেখায়।

Spirogyra-এর প্রত্যেকটি কোষে একটি করে নিউক্লিয়াস থাকে। কতকগুলি সাইটোপ্লাজমিক সূত্র নিউক্লিয়াসকে ধরে রাখে। কোষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বস্তু হলো ক্লোরোপ্লাস্ট (এটা উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের এবং ফিতার ন্যায় চ্যাপ্টা)। প্রজাতিভেদে একই কোষে ১টি হতে ১২টি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকতে পারে।ক্লোরোপ্লাস্ট দেখতে সর্পিলাকার (Spiral) এবং কোষপ্রাচীর সংলগ্ন অঞ্চল অধিকার করে কোষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রাপ্ত পর্যন্ত অবস্থান করে। এদের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থের একপ্রকার চকচকে দানা থাকে। যাকে পাইরিনয়েড বলা হয়। পাইরিনয়েডের চারপার্শ্বে শর্করার একটি আবরণ থাকে; যা Spirogyra-র সঞ্চিত খাদ্য।

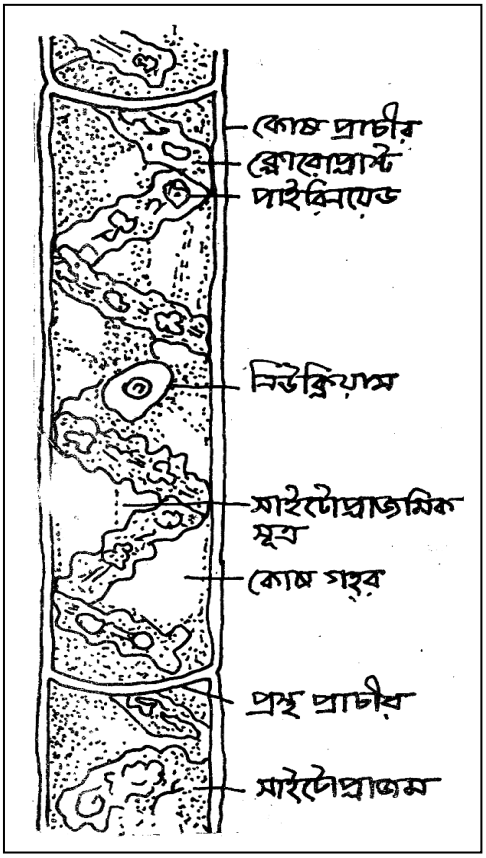

চিত্র ১৪.৪-২ : Spirogyra উদ্ভিদের দৈহিক গঠন

পরীক্ষণ (শৈবাল)

আপনার বাড়ির পাশে পুকুর, নর্দমা বা অন্য জলাশয়ে অনেক শৈবাল উপস্থিত। আপনি জলাশয় থেকে সবুজ রঙের জালিকার ন্যায় অবস্থিত সূত্রাকার শৈবালকে একটি পরিষ্কার কৌটায় সংগ্রহ করুন। ল্যাবরেটরিতে এসে একটি পরিষ্কার স্লাইডে সংগৃহীত শৈবালের কয়েকটা সূত্রাকার দেহ ফরসেপের সাহায্যে স্থাপন করুন। স্লাইডে রক্ষিত শৈবালের উপর এককোটা পানি দিয়ে কভার গ্লাস দ্বারা ঢেকে দিন। এরপর উক্ত স্লাইডটি অনুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে স্থাপন করে পর্যবেক্ষণ করুন। উক্ত শৈবালটি সূত্রাকার এবং উহার ক্লোরোপ্লাস্ট প্যাঁচানো (সর্পিলাকার) হলে, মনে করবেন শৈবালটি স্পাইরোগাইরা। এখন বইতে প্রদত্ত ছবির সাথে মিলিয়ে দেখুন।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ছত্রাকের ন্যায় শৈবালও আমাদের উপকার ও অপকার দুটাই করে থাকে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণিরা (যেমন- মাছ, গরু, মহিষ প্রভৃতি) শৈবালকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। মানুষের প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হিসেবে স্পাইরুলিনা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত এগার শৈবাল থেকে তৈরি হয়। সামুদ্রিক শৈবাল জমিতে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইউগ্লিনাকে মাছ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এছাড়া বাস্তুসংস্থানের খাদ্যচক্রে এককোষী শৈবাল প্রাথমিক খাদ্য প্রস্তুতকারক হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নীলাভ সবুজ শৈবাল বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ইউগ্লিনা অধিক পরিমাণে জন্মানোর ফলে পানিতে ওয়াটার ব্লুম তৈরি হয়, ফলে পানি দূষিত হয়ে পড়ে। উক্ত পানি মানুষ বা অন্যান্য প্রাণি পান করলে বিষক্রিয়া দেখা যেতে পারে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। শৈবাল বিভিন্ন উদ্ভিদ (যেমন- চাঁপা, চা, লিচু ইত্যাদি) এ মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে।

লাইকেন (Lichen)

লাইকেন হচ্ছে শৈবাল ও ছত্রাকের সহ অবস্থানের মাধ্যমে গঠিত এক বিশেষ ধরনের মিথোজীবি উদ্ভিদ। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, একটি শৈবাল এবং একটি ছত্রাকের সিমবায়োটিক সহ-অবস্থানের মাধ্যমে গঠিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিষমপৃষ্ঠ থ্যালয়েড উদ্ভিদকে লাইকেন বলা হয়।

লাইকেনে সবুজ শৈবাল খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ছত্রাককে পুষ্টি সরবরাহ করে, অন্যদিকে ছত্রাক পোষকের দেহ থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে শৈবালকে সরবরাহ করে। এমনিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শৈবাল ও ছত্রাক একত্রে বেঁচে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে মিথোজীবিতা (Symbiesis) বলে।

লাইকেন গাছের পাতা, বাকল, ক্ষয়প্রাপ্ত কাঠের গুড়ি, মাটি দেওয়াল, পাথর, শুষ্ক পর্বত গাত্র প্রভৃতি স্থানে জন্মে থাকে। এছাড়া সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, বরফাবৃত তুন্দ্রা অঞ্চল, মরুভূমি প্রভৃতি প্রতিকূল পরিবেশে যেখানে সাধারণত অন্যকোনো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, সেখানেও এরা ভালোভাবে জন্মাতে পারে। বাইরের গঠনের উপর ভিত্তি করে লাইকেনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক্লাস্টোজ লাইকেন, ফোলিয়োজ লাইকেন ও ফ্রুটিকোজ লাইকেন।

চিত্র ১৪.৪-৩ : বিভিন্ন প্রকার লাইকেন

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

লাইকেন ইহার উপকারী এবং অপকারী উভয় কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক ও উন্মুক্ত পর্বতগায়ে যেখানে অন্যকোনো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, সেখানে লাইকেন জন্মাতে পারে এবং ধীরে ধীরে পাথর ক্ষয় করে মাটিতে পরিণত করে। লাইকেনে লাইকোনিন নামক কার্বোহাইড্রেট আছে, তাই কতক লাইকেন মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ওষুধ প্রস্তুতে, রং তৈরিতে ও সুগন্ধি উৎপাদনে লাইকেন ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীর গাত্রে, বিল্ডিং-এর ছাদের লাইকেন জন্মিয়ে সে সকল স্থানে ক্ষত সৃষ্টি করে সহজে বিল্ডিং-এর দেওয়াল ও ছাদ নষ্ট করে ফেলে। গাছের বাকলে প্রচুর লাইকেন জন্মিয়ে গাছের ক্ষতিসাধন করে।

সারসংক্ষেপ

- শৈবাল থ্যালোফাইটা বা সমাঙ্গদেহী বিভাগের অন্তর্গত ক্লোরোফিল সমন্বিত একপ্রকার প্রাচীনতম ও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ।
- Spirogyra দেখতে আঁশের মতো চিকন, সুতাকৃতি, শাখা-প্রশাখা বিহীন, লম্বা বহুকোষী শৈবাল।
- স্পাইরুলিনা-নামক সূত্রাকার শৈবালকে মানুষ ব্যাপকভাবে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।
- ফানজাই বা ছত্রাক হচ্ছে এমন একটা উদ্ভিদগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন পরিবেশে মৃতজীবী বা পরজীবী হিসেবে বাস করে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে নানা ধরণের রোগ সৃষ্টি করে।
- Penicillium notatum নামক ছত্রাক থেকে 'পেনিসিলিন' নামক এন্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়।
- একটি শৈবাল এবং একটি ছত্রাকের সিমবায়োটিক সহ-অবস্থানের মাধ্যমে গঠিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিষমপৃষ্ঠ থ্যালয়েড উদ্ভিদকে লাইকেন বলে।
- লাইকেন মাটি গঠনে সহায়তা করে। এছাড়া রং তৈরিতে, ওষুধ শিল্পে ও সুগন্ধি শিল্পে লাইকেন ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ছত্রাক কোন ধরনের উদ্ভিদ?

ক. স্বভোজী খ. পরভোজী

গ. মৃতজীবি ঘ. আংশিক স্বভোজী

২. নিচের কোনটি ছত্রাক?

ক. এগারিকাস খ. স্পাইরুলিনা

গ. লাইকেন ঘ. স্পাইরোগাইরা

৩. শৈবাল কোন ধরনের উদ্ভিদ?

ক. পরভোজী খ. পরজীবি

গ. মিথজীবি ঘ. স্বভোজী

৪. নিচের কোনটি শৈবাল নহে?

ক. স্পাইরোগাইরা খ. স্পাইরুলিনা

গ. ব্যাঙের ছাতা ঘ. ইস্টক

৫. লাইকেন কোন ধরনের উদ্ভিদ?

ক. শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়ার সহ-অবস্থান খ. শৈবাল ও ভাইরাসের সহ-অবস্থান

গ. ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার সহ-অবস্থান গ. শৈবাল ও ছত্রাকের সহ-অবস্থান।

পাঠ ১৪.৫

ভ্রূণধারী উদ্ভিদ অপুষ্পক উদ্ভিদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভ্রূণধারী উদ্ভিদ বা এব্রায়োফাইটা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিতে পারবেন;
- ব্রায়োফাইটার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- মস উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ব্রায়োফাইটার অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখতে পারবেন;
- টেরিডোফাইটার সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ফার্ণ উদ্ভিদের বর্ণনা করতে পারবেন;
- টেরিডোফাইটার অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

ভ্রূণধারী উদ্ভিদ বা এমব্রায়োফাইটা

যে সকল উদ্ভিদ ভ্রূণসৃষ্টির মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়, তাদেরকে ভ্রুণধারী উদ্ভিদ বলে। পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষের নিষেকের ফলে নিষিক্ত কোষ তথা জাইগোটের (Zygote) সৃষ্টি হয়। এ জাইগোট পরে ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়। ভ্রূণধারী উদ্ভিদগুলো থ্যালোফাইটা (শৈবাল, ছত্রাক, লাইকেন প্রভৃতি) গ্রুপের উদ্ভিদগুলো থেকে উন্নততর। প্রোটোফাইটা (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি) ও থ্যালোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদগুলো ছাড়া আর সকল উদ্ভিদই ভ্রূণধারী উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রায়োফাইটা

ব্রায়োফাইটা সর্বাপেক্ষা সরল ও প্রাচীন ভ্রূণ সৃষ্টিকারী উদ্ভিদগোষ্ঠী। এ গ্রুপের উদ্ভিদগুলো থ্যালোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত। এদের দেহ ও পাতায় বিভক্ত করা যেতে পারে। তবে এ সকল উদ্ভিদে কখনও মূল জন্মায় না। তবে মূলের পরিবর্তে সূক্ষ্ম অভিক্ষেপ উৎপন্ন হয়, এদেরকে রাইজয়েড বলে। রাইজয়েড উদ্ভিদকে আবাসস্থলে আটকে রাখে এবং পুষ্টি শোষণ করে।

এ ধরণের উদ্ভিদগুলো ক্ষুদ্রাকার, সবুজ এবং মাটি, প্রাচীর অথবা পাহাড়ের গায়ে কার্পেটের মত জন্মে। কয়েকটি জলজ প্রজাতি ছাড়া এদের অধিকাংশই ছায়াযুক্ত অতি আর্দ্র স্থানে জন্মে। জলজ ও আর্দ্র পরিবেশের উপরই মূলত এরা নির্ভরশীল। এ গ্রুপের উদ্ভিদের একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে মস (Mos) নামীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশেও প্রচুর পরিমাণে মস উদ্ভিদ জন্মে। মস উদ্ভিদের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে Bryum নামক মস-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো। Cinje নামক মস সেঁতসেঁতে মাটি, গাছের গুঁড়ি, পুরাতন প্রাচীর প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

মস (Mos) **:** Bryum**-এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-**

- এদের রাইজয়েড (মূলের পরিবর্তে) কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
- এদের নরম খাটো কাণ্ডের চারিদিকে ছোট ছোট পাতা সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে।
- রাইজয়েডসহ সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিকে বলা হয় গ্যামেটোফাইট।
- পরিপক্ক গ্যামেটোফাইটের মাথায় স্পোরোফাইটের সৃষ্টি হয়।
- পুরুষ মস উদ্ভিদের দুই ফ্লাজেলাযুক্ত শুক্রাণু, স্ত্রী মস উদ্ভিদে সৃষ্ট অচল ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে স্পোরোফাইটের সৃষ্টি করে। স্পোরোফাইট স্ত্রী মস উদ্ভিদের মাথায় সৃষ্টি হয়।
- স্পোরোফাইটের ক্যাপসুলের ভিতরে স্পোর বা রেণু সৃষ্টি হয়। রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মস উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

পরীক্ষণ

বাড়ির দেওয়াল বা অন্য কোনো স্থান হতে কিছু মস উদ্ভিদ সংগ্রহ করে পরিষ্কার পলিথিনে রাখুন। এরপর একটি মস উদ্ভিদকে পরিষ্কার একটি স্লাইডের উপর স্থাপন করে আতশী কাঁচ অথবা ল্যাবরেটরিতে সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করুন। শেষে পাঠ্য বইয়ের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখুন।

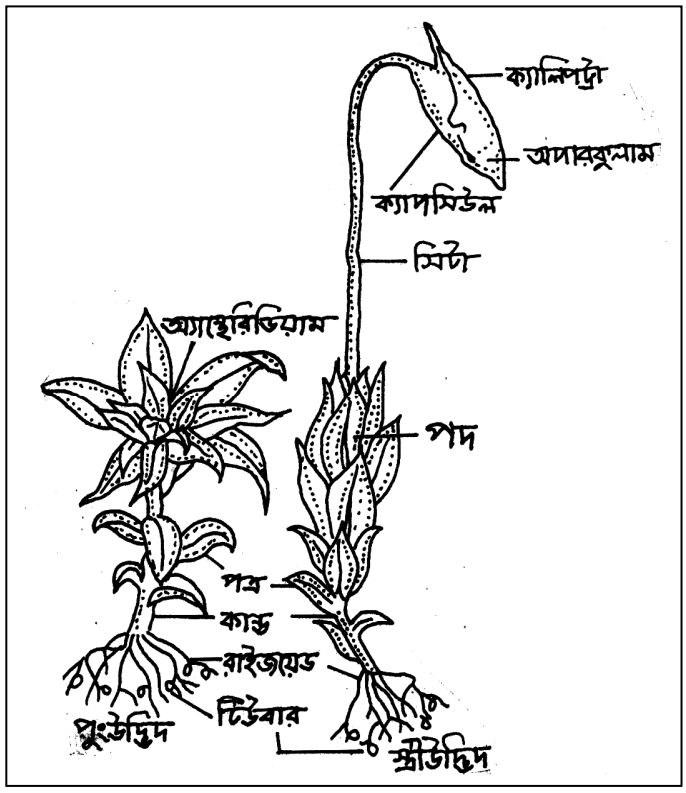

wPÎ 14.5-1 : GKwU gm (Bryam) উদ্ভিদ

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলে এরা আমাদের উপকার ও অপকার দুটাই করে থাকে। এরা কঠিন পদার্থের উপর আর্দ্র পরিবেশে জন্মাতে পারে এবং মাটি সৃষ্টিতে সহায়তা করে অর্থাৎ এরা উদ্ভিদ ক্রমাগমনে সহায়তা করে। তবে মস জাতীয় উদ্ভিদ বাড়ির দেওয়াল, ছাদ ইত্যাদি স্থানে জন্মে ক্ষতিসাধন করে।

টেরিডোফাইটা বা ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ

টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদগুলো ব্রায়োফাইটার চেয়ে উন্নততর। নিম্নশ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে এরা অপেক্ষাকৃত বড় এবং আমাদের অতি পরিচিত। আমরা বাড়ির চারপাশে ঠেঁকিশাক, সুষনিশাক জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাই, এগুলো ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ।

নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে একমাত্র ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। এরা স্বভোজী, অর্থাৎ নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে। এরা ছায়াযুক্ত স্থানে, ভিজা মাটিতে, পুরাতন দেওয়াল ও বড় বড় গাছের কাণ্ডের উপর জন্মায়। নিচে বহুল পরিচিত ফার্ণ উদ্ভিদ হিসেবে Pteris-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো-

ফার্ণ (Fern) : Pteris-এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

- এ উদ্ভিদটি স্পোরোফাইটিক;
- এদেরকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়;
- Pteris উদ্ভিদের কাণ্ড রাইজোম জাতীয়, মাটির সাথে সমান্তরালে অবস্থান করে এবং এর গায়ে শুল্কপত্র থাকে।
- পাতা চির সবুজ, যৌগিক এবং মুকুল অবস্থায় কুকুরের লেজের ন্যায় বাঁকানো থাকে। ফার্ণের পাতাকে ফ্রণ্ড বলে।
- পরিণত অবস্থায় পত্রকের কিনার বরাবর স্পোরাঞ্জিয়াম উৎপন্ন হয়। স্পোরাঞ্জিয়ামের স্ফীত অংশকে ক্যাপস্যুল বলে। ক্যাপস্যুলের ভিতরে স্পোর উৎপন্ন হয়।

- সেজার অঙ্কুরিত হয়ে সর্বশেষ নতুন Pteris উদ্ভিদের জন্ম হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরণের ফার্ণ উদ্ভিদকে শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঢেঁকিশাক জাতীয় ফার্ণ উদ্ভিদকে সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এরা বাড়ির দেওয়াল বা গাছের উপর জন্মে ক্ষতিসাধন করে।

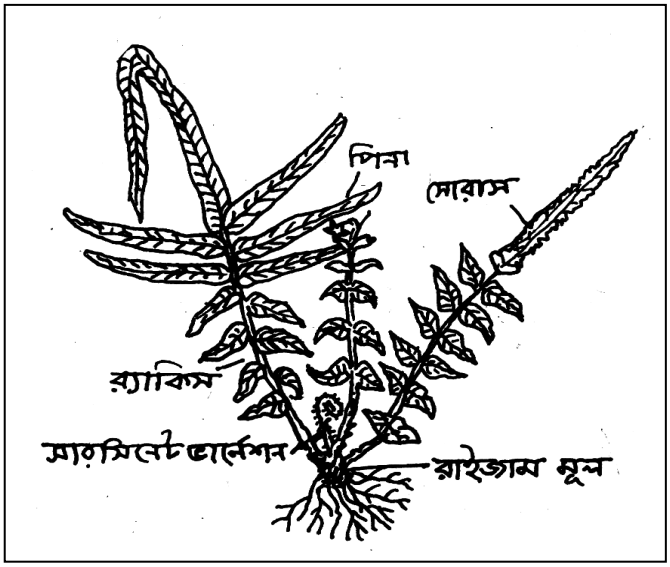

wPÎ 14.5-2 : GKwU dvY© (Pteris) উদ্ভিদ

সারসংক্ষেপ

- ব্রায়োফাইটা সর্বাপেক্ষা সরল ও প্রাচীন ভ্রূণসৃষ্টিকারী উদ্ভিদগোষ্ঠী। এদের উন্নত সদস্যদেরকে কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যেতে পারে তবে এদের কোনো মূল সৃষ্টি হয় না। ব্রায়োফাইটাতে মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড সৃষ্টি হয়।
- ব্রায়োফাইটা জাতীয় উদ্ভিদ (যেমন- মস) ক্রমাগমনে সহায়তা করে।
- টেরিডোফাইট জাতীয় উদ্ভিদ অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নততর।
- টেরিডোফাইটাকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। এরা মাটিতে, দেওয়ালে ও বড় গাছের উপর পরাশ্রয়ী হিসেবে জন্মে।
- টেরিডোফাইটা (যেমন- ফার্ণ, সিলাজিনেলা, লাইকোপোডিয়াম প্রভৃতি) কে শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঢেঁকিশাক জাতীয় ফার্ণকে সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি ব্রায়োফাইটার অন্তর্ভুক্ত?
   ক. সিলাজিনেলা খ. লাইকোপোডিয়াম
   গ. ব্রায়াম ঘ. টেরিস

২. নিচের কোনটি মস উদ্ভিদে পাওয়া যায়?
   ক. রাইজয়েড খ. মূল
   গ. ফুল ঘ. ফল

৩. নিচের কোনটি ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ?
   ক. ব্রায়াম খ. সিলাজিনেলা
   গ. রিক্সিয়া ঘ. মারকেনসিয়া

৪. অপুস্পক উদ্ভিদের মধ্যে কোনটি সর্বপেক্ষা উন্নতর?
ক. টেরিডোফাইটা খ. ব্রায়োফাইটা
গ. ব্যাকটেরিয়া ঘ. ভাইরাস।

পাঠ ১৪.৬

এমব্রায়োফাইটা-স্বপুষ্পক উদ্ভিদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বপুষ্পক উদ্ভিদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- নগ্নবীজী উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- নগ্নবীজী উদ্ভিদের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- গুপ্তবীজী উদ্ভিদের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে পারবেন।

স্পার্মাটোফাইটা বা স্বপুষ্পক উদ্ভিদ

যে সকল উদ্ভিদের ফুল উৎপন্ন হয়, তাদেরকে স্বপুষ্পক উদ্ভিদ বা স্পার্মাটোফাইটা বলে। আমাদের চারদিকে সচরাচর যে সকল উদ্ভিদ দেখতে পাই, এদের অধিকাংশই স্বপুষ্পক উদ্ভিদ, অর্থাৎ এ সকল উদ্ভিদে ফুল, ফল বা বীজ উৎপন্ন হয়। এসকল উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে থাকে এবং কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল প্রভৃতি মাটির উপরে থাকে। স্বপুষ্পক উদ্ভিদকে দুম্বভাগে ভাগ করা যায়। যথা- নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদ।

নগ্নবীজী উদ্ভিদ (Gymnospermae**)**

নগ্নবীজী উদ্ভিদে ফুল হয় এবং বীজও হয়, কিন্তু ফল হয় না। কোনো এদের ফুলে ডিম্বাশয় থাকে না, একই ডিম্বক নগ্ন অবস্থায় থাকে এবং নিষিক্ত হয়ে বীজে পরিণত হয়। এজন্য বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে। উদাহরণ- সাইকাস, পাইনাস, থুজা ইত্যাদি।

নিচে নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে সাইকাস (Cycas sp.) সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

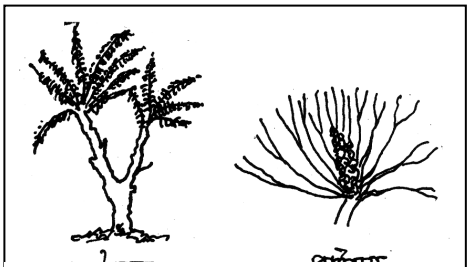

wPÎ 14.6-1 : bMœexRx উদ্ভিদ

সাইকাস উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

- সাইকাস উদ্ভিদ স্পোরোফাইট, এদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
- এদের পরিবহন টিস্যু আছে।
- পাতা যৌগিক এবং কাণ্ডের উপরিভাগে সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে। পাতা অনেকটা নারিকেল পাতার মত। মুকুল অবস্থায় পাতা কুণ্ডলিত থাকে।
- মূল দু'প্রকার; প্রধান মূল ও কোরালয়েড মূল।
- পুরুষ উদ্ভিদ ও স্ত্রী উদ্ভিদ আলাদা।
- স্ত্রী উদ্ভিদের মাথায় স্ত্রীরেণুপত্র এবং পুরুষ উদ্ভিদের মাথায় পুংরেণুপত্র জন্মে। পুংরেণুপত্র একত্রে মোচার মত দেখতে হয়।
- পরাগায়ন ও নিষেক শেষে বীজ উৎপন্ন হয়।
- বীজ উন্মুক্ত থাকে এবং অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে এটাকে টব, বাগান, পার্ক ও রাস্তার পাশে লাগানো হয়।

গুপ্তবীজী উদ্ভিদ (Angiospermae)

গুপ্তবীজী উদ্ভিদে ডিম্বাশয় থাকে। ডিম্বাশয়ের ভিতরে ডিম্বক নিষিক্ত হয়ে বীজে এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। বীজ, ফলের অভ্যন্তরে লুকানো থাকে বলে এদেরকে গুপ্তবীজী উদ্ভিদ বলে। উদাহরণ- আম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি।

গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা- একবীজপত্রী উদ্ভিদ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ।

একবীজপত্রী উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদের বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে, তাদেরকে একবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। এসকল উদ্ভিদের মূলতন্ত্র সাধারণত গুচ্ছাকার এবং পাতা সমান্তরাল যুক্ত হয়। উদাহরণ: ধান, গম, ইক্ষু, নারিকেল ইত্যাদি।

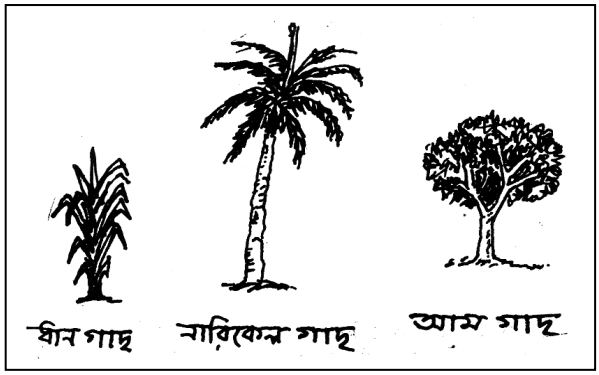

wPÎ 14.6-2 : ,ßexRx উদ্ভিদ

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদের বীজে দুটি বীজপত্র থাকে, তাদেরকে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। এসকল উদ্ভিদ প্রধানত প্রধান মূলতন্ত্র গঠন করে এবং পাতা জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত হয়। উদাহরণ: আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মানুষের নিকট স্বপুষ্পক উদ্ভিদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বহু উপাদানই আমরা এ ধরণের উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি।

- আমাদের প্রধান খাদ্য উপাদান, যেমন- ভাত, রুটি, পাউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি আমরা ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে পেয়ে থাকি।
- আমরা ফল হিসেবে আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু, জাম্বুরা, ডালিম, আঙ্গুর, কমলা, আপেল, পেয়ারা, কলা, বরই ইত্যাদি খেয়ে থাকি।
- আমরা সবজি হিসেবে ব্যবহার করি বেগুন, ঝিঙ্গা, পটল, গোলআলু, ফুলকপি, বাঁধা কপি, বরবটি, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, লাল শাক, পেঁপে ইত্যাদি।
- আমরা শাল, সেগুন, কাঁঠাল, নিম, শিরিস, আম, বাঁশ, কড়ই, গর্জন, তেতুঁল, জাম, প্রভৃতি উদ্ভিদকে গৃহনির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করি।
- নিম, বাসক, থানকুনি, স্বর্পগন্ধা, আমলকি, হরিতকি, বহেরা, অর্জুন, চিরতা প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে ওষুধ তৈরি করি।
- লেখাপড়ার জন্য ব্যবহৃত কাগজ তৈরিতে বাঁশ, গেওয়া, আখের ছোবড়া, সবুজ পাট ইত্যাদি ব্যবহার করি।
- বাগানের শোভাবর্ধনে আমরা গোলাপ, ডালিয়া, কসমস, গাঁদা, নয়নতারা, রঙ্গন প্রভৃতি ফুলের চাষ করি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রাত্যহিক খাবার থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনে চলাচলের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা স্বপুষ্পক উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

উপরে আলোচিত উদ্ভিদ জগতের অধীন সকল উদ্ভিদকে চিত্র ১৪.৬-৩ আকারে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে-

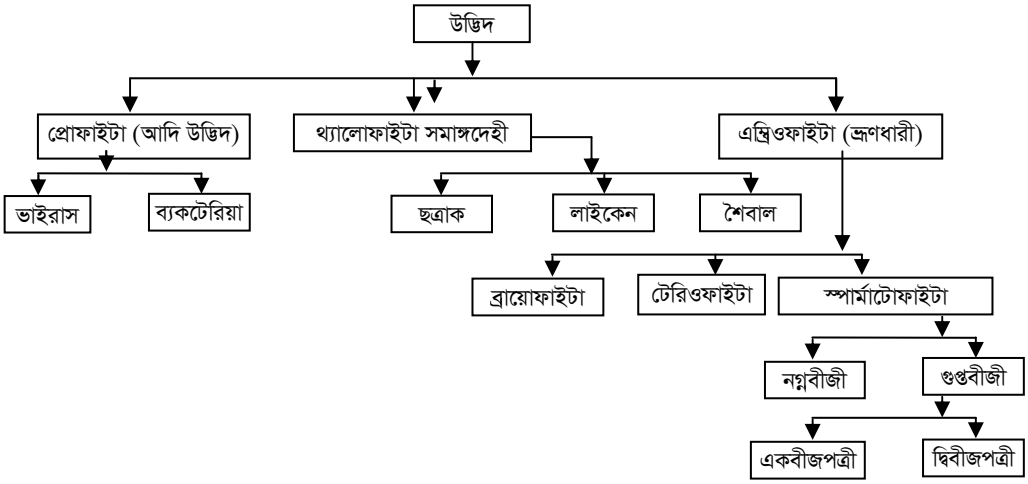

চিত্র ১৪.৬-৩ : উদ্ভিদ জগতের শ্রেণীবিন্যাস

সারসংক্ষেপ

- যে সকল উদ্ভিদে ফুল উৎপন্ন হয়, তাদেরকে স্বপুষ্পক উদ্ভিদ বলে।
- স্বপুষ্পক উদ্ভিদকে দুম্বভাবে ভাগ করা যায়, যথা- নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদ।
- নগ্নবীজী উদ্ভিদে ফুল ও বীজ হয় কিন্তু ফল হয় না।
- গুপ্তবীজী উদ্ভিদে ফুল, ফল ও বীজ হয়।
- গুপ্তবীজী উদ্ভিদ দুম্বধরনের, যথা- একবীজপত্রী উদ্ভিদ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ।
- একবীজপত্রী উদ্ভিদে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে দুটি বীজপত্র থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি নগ্নবীজী উদ্ভিদ?
   ক. আম খ. সাইকাস
   গ. ধান ঘ. পাট

২. নিচের কোনটি গুপ্তবীজী উদ্ভিদ?
   ক. সাইকাস খ. পাইনাস
   গ. থুজা ঘ. কলা

৩. নিচের কোনটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ নয়?
   ক. জাম খ. বাঁশ
   গ. ধান ঘ. গম

৪. নিচের কোনটি গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নহে?
   ক. একবীজপত্র বীজ খ. দ্বিবীজপত্রী বীজ
   গ. উন্মুক্ত বীজ ঘ. আবৃত বীজ

৫. কোনটি দ্বিবীজপত্র উদ্ভিদ?
   ক. ইক্ষু খ. তেতুঁল
   গ. বাঁশ ঘ. কলা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাসের সংজ্ঞা দিন। উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাসের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

২. ভাইরাস কি? ভাইরাসের গঠন প্রকৃতি আলোচনা করুন।

৩. চিত্রসহ T_2 ব্যাকটেরিওফাজের বর্ণনা দিন।

৪. ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৫. ব্যাকটেরিয়া কি? ব্যাকটেরিয়ার গঠন প্রকৃতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি বর্ণনা করুন।

৬. ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্বগুলো উল্লেখ করুন।

৭. মস ও ফার্ণ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

৮. টীকা লিখুন : ক. শৈবাল খ. ছত্রাক গ. লাইকেন ঘ. ব্রায়োফাইট
ঙ. টেরিডোফাইট চ. নগ্নবীজী উদ্ভিদ ছ. গুপ্তবীজী উদ্ভিদ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১ : ১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২ : ১. ক ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ ৫.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩ : ১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪ : ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫ : ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬ : ১. খ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. খ।